শিশু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিশু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী

প্রকাশ মোহিতচন্দ্র সেন -কর্তৃক সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ ১৩১০
...
পুনর্মুদ্রণ ১৩২৬, ১৩৩০, মাঘ ১৩৩২, আশ্বিন ১৩৩৮, ভাদ্র ১৩৪০
পৌষ ১৩৪২, পৌষ ১৩৪৪, পৌষ ১৩৪৫, মাঘ ১৩৪৬, ভাদ্র ১৩৪৮
পৌষ ১৩৪৮, অগ্রহায়ণ ১৩৫০, আষাঢ় ১৩৫১, চৈত্র ১৩৫১
পৌষ ১৩৫৪, মাঘ ১৩৫৫, বৈশাখ ১৩৫৮, মাঘ ১৩৫৯, পৌষ ১৩৬১
অগ্রহায়ণ ১৩৬২, বৈশাখ ১৩৬৩, ফাল্গুন ১৩৬৪, বৈশাখ ১৩৬৬
মাঘ ১৩৬৭, মাঘ ১৩৬৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২, পৌষ ১৩৭৫
সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৭৯
পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৩৮৩, ভাদ্র ১৩৮৭, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯, ফাল্গুন ১৩৯১, পৌষ ১৩৯৪
বৈশাখ ১৩৯৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭, আষাঢ় ১৩৯৮, শ্রাবণ ১৩৯৯, আষাঢ় ১৪০১
কার্তিক ১৪০২, মাঘ ১৪০২, আশ্বিন ১৪০৪, অগ্রহায়ণ ১৪০৬
পৌষ ১৪০৮, বৈশাখ ১৪১০, বৈশাখ ১৪১১, শ্রাবণ ১৪১২
মাঘ ১৪১৩, বৈশাখ ১৪১৬, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭
মাঘ ১৪২০, পৌষ ১৪২৪
পৌষ ১৪২৬

© বিশ্বভারতী

মূল্য : ১০০.০০ টাকা

ISBN 978-81-7522-058-4

প্রকাশক অমৃত সেন
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা ১৭

মুদ্রক প্রিন্টটেক
১৫এ অম্বিকা মুখার্জি রোড। কলকাতা ৫৬

শিরোনামসূচী

জগৎ-পারাবারের তীরে	•	৯
অপযশ	•	২১
অভিমানিনী	•	১২৬
অস্তসখী	•	১১০
আকুল আহ্বান	•	১৫০
আশীর্বাদ	•	১৬৯
উপহার	•	১২১
কাগজের নৌকা	•	১৩৯
কেন মধুর	•	২৯
খেলা	•	১৩
খোকা	•	১৬
খোকার রাজ্য	•	৩০
ঘুম	•	১৩৫
ঘুম-চোরা	•	১৯
চাতুরী	•	২৫
ছুটির দিনে	•	৬২
ছোটোবড়ো	•	৪৭
জন্মকথা	•	১১
জ্যোতিষশাস্ত্র	•	৭০
দুঃখহারী	•	৭৯
নদী	•	৮৩

নবীন অতিথি	•	১০৯
নির্লিপ্ত	•	২৭
নৌকাযাত্রা	•	৬০
পরিচয়	•	১১৫
পাখির পালক	•	১২৪
পুরোনো বট	•	১৫৩
পূজার সাজ	•	১২৭
প্রশ্ন	•	৩৭
ফুলের ইতিহাস	•	১৪৮
বনবাস	•	৬৬
বিচার	•	২৩
বিচিত্র সাধ	•	৩৯
বিচ্ছেদ	•	১১৯
বিজ্ঞ	•	৪৩
বিদায়	•	৮১
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর	•	৯৬
বিম্ববতী	•	১০৫
বীরপুরুষ	•	৫২
বিসর্জন	•	১৫২
বৈজ্ঞানিক	•	৭২
ব্যাকুল	•	৪৫
ভিতরে ও বাহিরে	•	৩৩
মঙ্গলগীত	•	১৬০

মাঝি	•	৫৭
মাতৃবৎসল	•	৭৫
মালক্ষ্মী	•	১৩১
মাস্টার-বাবু	•	৪১
রাজার বাড়ি	•	৫৫
লুকোচুরি	•	৭৭
শিশুর মৃত্যু	•	১৪৯
শীত	•	১৪৩
শীতের বিদায়	•	১৪৬
সমব্যথী	•	৩৮
সমালোচক	•	৫০
সাত ভাই চম্পা	•	১০০
সাধ	•	১৩৭
সুখদুঃখ	•	১৩০
সূর্য ও ফুল	•	১৪২
স্নেহময়ী	•	১৩৩
স্নেহস্মৃতি	•	১৫৮
হাসিরাশি	•	১১২

জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
অন্তহীন গগনতল
মাথার 'পরে অচঞ্চল,
ফেনিল ওই সুনীল জল
নাচিছে সারা বেলা।
উঠিছে তটে কী কোলাহল—
ছেলেরা করে মেলা ॥

বালুকা দিয়ে বাঁধিছে ঘর,
ঝিনুক নিয়ে খেলা।
বিপুল নীল সলিল-'পরি
ভাসায় তারা খেলার তরী
আপন হাতে হেলায় গড়ি
পাতায় গাঁথা ভেলা।
জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে খেলা ॥

জানে না তারা সাঁতার দেওয়া,
জানে না জাল ফেলা।
ডুবারি ডুবে মুকুতা চেয়ে,
বণিক ধায় তরণী বেয়ে—

ছেলেরা নুড়ি কুড়ায়ে পেয়ে
সাজায় বসি ঢেলা।
রতন ধন খোঁজে না তারা,
জানে না জাল ফেলা ॥

ফেনিয়ে উঠে সাগর হাসে,
হাসে সাগর-বেলা।
ভীষণ ঢেউ শিশুর কানে
রচিছে গাথা তরল তানে,
দোলনা ধরি যেমন গানে,
জননী দেয় ঠেলা।
সাগর খেলে শিশুর সাথে,
হাসে সাগর-বেলা ॥

জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
ঝঞ্ঝা ফিরে গগনতলে,
তরণী ডুবে সুদূর জলে,
মরণদূত উড়িয়া চলে—
ছেলেরা করে খেলা।
জগৎ-পারাবারের তীরে
শিশুর মহামেলা ॥

[আলমোড়া
৬ ভাদ্র ১৩১০]

জন্মকথা

খোকা মাকে শুধায় ডেকে,
'এলেম আমি কোথা থেকে—
কোন্‌খেনে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।'
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তার বুকে বেঁধে—
ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে ॥

ছিলি আমার পুতুল-খেলায়,
প্রভাতে শিব-পূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি।
তুই আমার ঠাকুরের সনে
ছিলি পূজার সিংহাসনে,
তাঁরি পূজায় তোমার পূজা করেছি ॥

আমার চিরকালের আশায়,
আমার সকল ভালোবাসায়,
আমার মায়ের দিদিমায়ের পরানে—
পুরানো এই মোদের ঘরে
গৃহদেবীর কোলের 'পরে
কত কাল যে লুকিয়ে ছিলি কে জানে ॥

যৌবনেতে যখন হিয়া
উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া
তুই ছিলি সৌরভের মতো মিলায়ে,

আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে
জড়িয়ে ছিলি সঙ্গে সঙ্গে
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে॥

সব দেবতার আদরের ধন
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী—
তুই জগতের স্বপ্ন হতে
এসেছিস আনন্দস্রোতে
নূতন হয়ে আমার বুকে বিলসি॥

নির্নিমেষে তোমায় হেরে
তোর রহস্য বুঝি নে রে,
সবার ছিলি আমার হলি কেমনে।
ওই দেহে এই দেহ চুমি
মায়ের খোকা হয়ে তুমি
মধুর হেসে দেখা দিলে ভুবনে॥

'হারাই হারাই' ভয়ে গো তাই
বুকে চেপে রাখতে যে চাই,
কেঁদে মরি একটু সরে দাঁড়ালে।
জানি নে কোন্ মায়ায় ফেঁদে
বিশ্বের ধন রাখব বেঁধে
আমার এ ক্ষীণ বাহু দুটির আড়ালে॥

[আলমোড়া
৩২? শ্রাবণ ১৩১০]

খেলা

তোমার কটি-তটের ধটি
কে দিল রাঙিয়া!
কোমল গায়ে দিল পরায়ে
রঙিন আঙিয়া!
বিহান বেলা আঙিনাতলে
এসেছ তুমি কী খেলাছলে,
চরণ দুটি চলিতে ছুটি
পড়িছে ভাঙিয়া।
তোমার কটি-তটের ধটি
কে দিল রাঙিয়া॥

কিসের সুখে সহাস মুখে
নাচিছ বাছনি,
দুয়ার-পাশে জননী হাসে
হেরিয়া নাচনি।
তাথেই-থেই তালির সাথে
কাঁকন বাজে মায়ের হাতে,
রাখাল-বেশে ধরেছ হেসে
বেণুর পাঁচনি।
কিসের সুখে সহাস মুখে
নাচিছ বাছনি॥

ভিখারী ওরে, অমন ক'রে
শরম ভুলিয়া
মাগিস কিবা মায়ের গ্রীবা
আঁকড়ি ঝুলিয়া।
ওরে রে লোভী, ভুবনখানি
গগন হতে উপাড়ি আনি
ভরিয়া দুটি ললিত মুঠি
দিব কি তুলিয়া।
কী চাস ওরে, অমন ক'রে
শরম ভুলিয়া॥

নিখিল শোনে আকুল-মনে
নূপুর-বাজনা।
তপন শশী হেরিছে বসি
তোমার সাজনা।
ঘুমাও যবে মায়ের বুকে
আকাশ চেয়ে রহে ও মুখে,
জাগিলে পরে প্রভাত করে
নয়ন-মাজনা।
নিখিল শোনে আকুল-মনে
নূপুর-বাজনা॥

ঘুমের বুড়ি আসিছে উড়ি
নয়ন-ঢুলানী,

গায়ের 'পরে কোমল করে
পরশ-বুলানী।
মায়ের প্রাণে তোমারি লাগি
জগৎ-মাতা রয়েছে জাগি,
ভুবন-মাঝে নিয়ত রাজে
ভুবন-ভুলানী।
ঘুমের বুড়ি আসিছে উড়ি
নয়ন-ঢুলানী॥

[আলমোড়া
৫ শ্রাবণ ১৩১০]

খোকা

খোকার চোখে যে ঘুম আসে
সকল-তাপ-নাশা—
জান কি কেউ কোথা হতে যে
করে সে যাওয়া-আসা।
শুনেছি রূপকথার গাঁয়ে
জোনাকি-জ্বলা বনের ছায়ে
দুলিছে দুটি পারুল কুঁড়ি
তাহারি মাঝে বাসা—
সেখান হতে খোকার চোখে
করে সে যাওয়া-আসা॥

খোকার ঠোঁটে যে হাসিখানি
চমকে ঘুমঘোরে—
কোন্ দেশে যে জনম তার
কে কবে তাহা মোরে।
শুনেছি কোন্ শরৎ-মেঘে
শিশু-শশীর কিরণ লেগে
সে হাসিরুচি জনমি ছিল
শিশিরশুচি ভোরে—
খোকার ঠোঁটে যে হাসিখানি
চমকে ঘুমঘোরে॥

খোকার গায়ে মিলিয়ে আছে
যে কচি কোমলতা—
জান কি সে যে এতটা কাল
লুকিয়ে ছিল কোথা।
মা যবে ছিল কিশোরী মেয়ে
করুণ তারি পরান ছেয়ে
মাধুরীরূপে মুরছি ছিল,
কহে নি কোনো কথা—
খোকার গায়ে মিলিয়ে আছে
যে কচি কোমলতা॥

আশিস আসি পরশ করে
খোকারে ঘিরে ঘিরে—
জান কি কেহ কোথা হতে সে
বরষে তার শিরে।
ফাগুনে নব মলয়শ্বাসে,
শ্রাবণে নব নীপের বাসে,
আশিনে নব ধান্যদলে,
আষাঢ়ে নব নীরে—
আশিস আসি পরশ করে
খোকারে ঘিরে ঘিরে॥

এই-যে খোকা তরুণতনু
নতুন মেলে আঁখি—
ইহার ভার কে লবে আজি
তোমরা জান তা কি?

হিরণময়-কিরণ-ঝোলা
যাঁহার এই ভুবন-দোলা
তপন শশী তারার কোলে
দেবেন এরে রাখি—
এই-যে খোকা তরুণতনু
নতুন মেলে আঁখি ॥

[আলমোড়া
শ্রাবণ ১৩১০]

ঘুম-চোরা

কে নিল খোকার ঘুম হরিয়া।
মা তখন জল নিতে ও পাড়ার দিঘিটিতে
গিয়েছিল ঘট কাঁখে করিয়া।—
তখন রোদের বেলা সবাই ছেড়েছে খেলা,
ও পারে নীরব চখা-চখীরা,
শালিখ থেমেছে ঝোপে, শুধু পায়রার খোপে
বকাবকি করে সখা-সখীরা;
তখন রাখাল ছেলে পাঁচনি ধুলায় ফেলে
ঘুমিয়ে পড়েছে বটতলাতে।
বাঁশ-বাগানের ছায়ে এক মনে এক পায়ে
খাড়া হয়ে আছে বক জলাতে।
সেই ফাঁকে ঘুমচোর ঘরেতে পশিয়া মোর
ঘুম নিয়ে উড়ে গেল গগনে—
মা এসে অবাক রয়, দেখে খোকা ঘর-ময়
হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে সঘনে।

আমার খোকার ঘুম নিল কে।
যেথা পাই সেই চোরে বাঁধিয়া আনিব ধরে,
সে লোক লুকাবে কোথা ত্রিলোকে।
যাব সে গুহার ছায়ে কালো পাথরের গায়ে
কুলু কুলু বহে যেথা ঝরনা।
যাব সে বকুলবনে নিরিবিলি যে বিজনে
ঘুঘুরা করিছে ঘর-করনা।

যেখানে সে বুড়া বট নামায়ে দিয়েছে জট,
ঝিল্লি ডাকিছে দিনে দুপুরে,
যেখানে বনের কাছে বনদেবতারা নাচে
চাঁদিনিতে রুনুঝুনু নূপুরে,
যাব আমি ভরা সাঁঝে সেই বেণুবনমাঝে
আলো যেথা রোজ জ্বালে জোনাকি—
শুধাব মিনতি করে, 'আমাদের ঘুমচোরে
তোমাদের আছে জানা-শোনা কি?'

কে নিল খোকার ঘুম চুরায়ে।
কোনোমতে দেখা তার পাই যদি একবার
লই তবে সাধ মোর পুরায়ে।
দেখি তার বাসা খুঁজি কোথা ঘুম করে পুঁজি
চোরা ধন রাখে কোন্ আড়ালে।
সব লুটি লব তার, ভাবিতে হবে না আর
খোকার চোখের ঘুম হারালে।
ডানা দুটি বেঁধে তারে নিয়ে যাব নদীপারে,
সেখানে সে ব'সে এক কোণেতে
জলে শরকাঠি ফেলে মিছে মাছ-ধরা খেলে
দিন কাটাইবে কাশবনেতে।
যখন সাঁঝের বেলা ভাঙিবে হাটের মেলা,
ছেলেরা মায়ের কোল ভরিবে,
সারা রাত টিটি-পাখি টিট্‌কারি দিবে ডাকি—
'ঘুমচোরা, কার ঘুম হরিবে।'

অপযশ

বাছা রে, তোর চক্ষে কেন জল।
কে তোরে যে কী বলেছে
আমায় খুলে বল্‌।
লিখতে গিয়ে হাতে মুখে
মেখেছ সব কালি,
নোংরা ব'লে তাই দিয়েছে গালি?
ছি ছি, উচিত এ কি।
পূর্ণশশী মাখে মসী
নোংরা বলুক দেখি॥

বাছা রে, তোর সবাই ধরে দোষ।
আমি দেখি সকল-তাতে
এদের অসন্তোষ।
খেলতে গিয়ে কাপড়খানা
ছিঁড়েখুঁড়ে এলে
তাই কি বলে লক্ষ্মীছাড়া ছেলে?
ছি ছি, কেমন ধারা?
ছেঁড়া মেঘে প্রভাত হাসে,
সে কি লক্ষ্মীছাড়া॥

কান দিয়ো না তোমায় কে কী বলে।
তোমার নামে অপবাদ যে
ক্রমেই বেড়ে চলে।

মিষ্টি তুমি ভালোবাস,
তাই কি ঘরে পরে
লোভী ব'লে তোমার নিন্দে করে।
ছি ছি, হবে কী।
তোমায় যারা ভালোবাসে
তারা তবে কী॥

বিচার

আমার খোকার কত যে দোষ
সে-সব আমি জানি,
লোকের কাছে মানি বা নাই মানি।
দুষ্টামি তার পারি কিম্বা
নারি থামাতে,
ভালোমন্দ বোঝাপড়া
তাতে আমাতে।
বাহির হতে তুমি তারে
যেমনি কর দুষী
যত তোমার খুশি,
সে বিচারে আমার কী বা হয়।
খোকা ব'লেই ভালোবাসি,
ভালো ব'লেই নয়॥

খোকা আমার কতখানি
সে কি তোমরা বোঝ।
তোমরা শুধু দোষ গুণ তার খোঁজ।
আমি তারে শাসন করি
বুকেতে বেঁধে,
আমি তারে কাঁদাই যে গো
আপনি কেঁদে।
বিচার করি, শাসন করি,
করি তারে দুষী,

আমার যাহা খুশি।
তোমার শাসন আমরা মানি নে গো।
শাসন করা তারেই সাজে
সোহাগ করে যে গো॥

চাতুরী

আমার খোকা করে গো যদি মনে
এখনি উড়ে পারে সে যেতে
পারিজাতের বনে।
যায় না সে কি সাধে।
মায়ের বুকে মাথাটি থুয়ে
সে ভালোবাসে থাকিতে শুয়ে
মায়ের মুখ না দেখে যদি
পরান তার কাঁদে॥

আমার খোকা সকল কথা জানে।
কিন্তু তার এমন ভাষা
কে বোঝে তার মানে।
মৌন থাকে সাধে?
মায়ের মুখে মায়ের কথা
শিখিতে তার কী আকুলতা,
তাকায় তাই বোবার মতো
মায়ের মুখচাঁদে॥

খোকার ছিল রতনমণি কত—
তবু সে এল কোলের 'পরে
ভিখারিটির মতো।
এমন দশা সাধে?
দীনের মতো করিয়া ভান
কাড়িতে চাহে মায়ের প্রাণ,

তাই সে এল বসনহীন
সন্ন্যাসীর ছাঁদে ॥

খোকা যে ছিল বাঁধন-বাধা-হারা—
যেখানে জাগে নূতন চাঁদ,
ঘুমায় শুকতারা।
ধরা সে দিল সাধে?
অমিয়মাখা কোমল বুকে
হারাতে চায় অসীম সুখে,
মুকতি চেয়ে বাঁধন মিঠা
মায়ের মায়াফাঁদে ॥

আমার খোকা কাঁদিতে জানিত না;
হাসির দেশে করিত শুধু
সুখের আলোচনা।
কাঁদিতে চাহে সাধে?
মধুমুখের হাসিটি দিয়া
টানে সে বটে মায়ের হিয়া,
কান্না দিয়ে ব্যথার ফাঁসে
দ্বিগুণ বলে বাঁধে ॥

[আলমোড়া
৭ শ্রাবণ ১৩১০]

নির্লিপ্ত

বাছা রে মোর বাছা,
ধূলির 'পরে হরষভরে
লইয়া তৃণগাছা
আপন-মনে খেলিছ কোণে,
কাটিছে সারা বেলা।
হাসি গো দেখে এ ধূলি মেখে
এ তৃণ লয়ে খেলা ॥

আমি যে কাজে রত,
লইয়া খাতা ঘুরাই মাথা
হিসাব কষি কত,
আঁকের সারি হতেছে ভারী,
কাটিয়া যায় বেলা—
ভাবিছ দেখি, মিথ্যা একি
সময় নিয়ে খেলা ॥

বাছা রে মোর বাছা,
খেলিতে ধূলি গিয়েছি ভুলি
লইয়ে তৃণগাছা।
কোথায় গেলে খেলেনা মেলে
ভাবিয়া কাটে বেলা,
বেড়াই খুঁজি করিতে পুঁজি
সোনারুপার ঢেলা ॥

যা পাও চারি দিকে
তাহাই ধরি তুলিছ গড়ি
মনের সুখটিকে।
না পাই যারে চাহিয়া তারে
আমার কাটে বেলা,
আশাতীতেরই আশায় ফিরি
ভাসাই মোর ভেলা॥

কেন মধুর

রঙিন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে
তখন বুঝি রে বাছা, কেন যে প্রাতে
এত রঙ খেলে মেঘে, জলে রঙ ওঠে জেগে,
কেন এত রঙ লেগে ফুলের পাতে—
রাঙা খেলা দেখি ও রাঙা হাতে ॥

গান গেয়ে তোরে আমি নাচাই যবে
আপন হৃদয়-মাঝে বুঝি রে তবে
পাতায় পাতায় বনে ধ্বনি এত কী কারণে,
ঢেউ বহে নিজমনে তরলরবে—
বুঝি তা তোমারে গান শুনাই যবে ॥

যখন নবনী দিই লোলুপ করে,
হাতে মুখে মেখেচুকে বেড়াও ঘরে,
তখন বুঝিতে পারি স্বাদু কেন নদীবারি,
ফল মধুরসে ভারী কিসের তরে—
যখন নবনী দিই লোলুপ করে ॥

যখন চুমিয়ে তোর বদনখানি
হাসিটি ফুটায়ে তুলি তখনই জানি
আকাশ কিসের সুখে আলো দেয় মোর মুখে,
বায়ু দিয়ে যায় বুকে অমৃত আনি—
বুঝি তা চুমিলে তোর বদনখানি ॥

খোকার রাজ্য

খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে
আমি যদি পারি বাসা নিতে
তবে আমি একবার
জগতের পানে তার
চেয়ে দেখি বসি সে নিভৃতে।

তার রবি শশী তারা
জানি নে কেমনধারা
সভা করে আকাশের তলে,
আমার খোকার সাথে
গোপনে দিবসে রাতে
শুনেছি তাদের কথা চলে।

শুনেছি আকাশ তারে
নামিয়া মাঠের পারে
লোভায় রঙিন ধনু হাতে,
আসি শালবন-'পরে
মেঘেরা মন্ত্রণা করে
খেলা করিবারে তার সাথে।

যারা আমাদের কাছে
নীরব গম্ভীর আছে,
আশার অতীত যারা সবে,

খোকারে তাহারা এসে
ধরা দিতে চায় হেসে
কত রঙে কত কলরবে॥

খোকার মনের ঠিক মাঝখান ঘেঁষে
যে পথ গিয়েছে সৃষ্টিশেষে
সকল উদ্দেশ-হারা
সকল ভূগোল-ছাড়া
অপরূপ অসম্ভব দেশে—

যেথা আসে রাত্রিদিন
সর্ব-ইতিহাস-হীন
রাজার রাজত্ব হতে হাওয়া,
তারি যদি এক ধারে
পাই আমি বসিবারে,
দেখি কারা করে আসা-যাওয়া।

তাহারা অদ্ভুত লোক,
নাই কারো দুঃখ শোক,
নেই তারা কোনো কর্মে কাজে,
চিন্তাহীন মৃত্যুহীন
চলিয়াছে চিরদিন
খোকাদের গল্পলোক-মাঝে॥

সেথা ফুল গাছপালা
নাগকন্যা রাজবালা

মানুষ রাক্ষস পশু পাখি
যাহা খুশি তাই করে,
সত্যেরে কিছু না ডরে,
সংশয়েরে দিয়ে যায় ফাঁকি।

ভিতরে ও বাহিরে

খোকা থাকে জগৎ-মায়ের
অন্তঃপুরে—
তাই সে শোনে কত যে গান
কতই সুরে।
নানান রঙে রাঙিয়ে দিয়ে
আকাশ পাতাল
মা রচেছেন খোকার খেলা-
ঘরের চাতাল।
তিনি হাসেন, যখন তরু-
লতার দলে
খোকার কাছে পাতা নেড়ে
প্রলাপ বলে।
সকল নিয়ম উড়িয়ে দিয়ে
সূর্য শশী
খোকার সাথে হাসে, যেন
এক-বয়সী।
সত্যবুড়ো নানা রঙের
মুখোশ প'রে
শিশুর সনে শিশুর মতো
গল্প করে।
চরাচরের সকল কর্ম
ক'রে হেলা
মা যে আসেন খোকার সঙ্গে

করতে খেলা।
খোকার জন্যে করেন সৃষ্টি
যা ইচ্ছে তাই—
কোনো নিয়ম কোনো বাধা-
বিপত্তি নাই।
বোবাদেরও কথা বলান
খোকার কানে,
অসাড়কেও জাগিয়ে তোলেন
চেতন প্রাণে।
খোকার তরে গল্প রচে
বর্ষা শরৎ,
খেলার গৃহ হয়ে ওঠে
বিশ্বজগৎ।
খোকা তারি মাঝখানেতে
বেড়ায় ঘুরে,
খোকা থাকে জগৎ-মায়ের
অন্তঃপুরে॥

আমরা থাকি জগৎ-পিতার
বিদ্যালয়ে—
উঠেছে ঘর পাথর-গাঁথা
দেয়াল লয়ে।
জ্যোতিষশাস্ত্র-মতে চলে
সূর্য শশী,
নিয়ম থাকে বাগিয়ে লয়ে

রশারশি।
এম্‌নি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে
বৃক্ষ লতা
যেন তারা বোঝেই নাকো
কোনোই কথা।
চাঁপার ডালে চাঁপা ফোটে
এম্‌নি ভানে
যেন তারা সাত ভায়েরে
কেউ না জানে।
মেঘেরা চায় এম্‌নিতরো
অবোধ ভাবে
যেন তারা জানেই নাকো
কোথায় যাবে।
ভাঙা পুতুল গড়ায় ভুঁয়ে
সকল বেলা,
যেন তারা কেবল শুধু
মাটির ঢেলা।
দিঘি থাকে নীরব হয়ে
দিবারাত্র,
নাগকন্যের কথা যেন
গল্পমাত্র।
সুখদুঃখ এম্‌নি বুকে
চেপে রহে
যেন তারা কিছুমাত্র
গল্প নহে।

যেমন আছে তেম্‌নি থাকে
যে যাহা তাই,
আর যে কিছু হবে এমন
ক্ষমতা নাই।
বিশ্বগুরু-মশায় থাকেন
কঠিন হয়ে,
আমরা থাকি জগৎ-পিতার
বিদ্যালয়ে॥

প্রশ্ন

মা গো, আমায় ছুটি দিতে বল্,
    সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা।
এখন আমি তোমার ঘরে বসে
    করব শুধু পড়া-পড়া খেলা।
    তুমি বলছ দুপুর এখন সবে,
    নাহয় যেন সত্যি হল তাই।
একদিনও কি দুপুর বেলা হলে
    বিকেল হল মনে করতে নাই?
আমি তো বেশ ভাবতে পারি মনে—
    সুয্যি ডুবে গেছে মাঠের শেষে,
বাগ্‌দি বুড়ি চুব্‌ড়ি ভরে নিয়ে
    শাক তুলেছে পুকুর-ধারে এসে।
আঁধার হল মাদার গাছের তলা,
    কালি হয়ে এল দিঘির জল,
হাটের থেকে সবাই এল ফিরে,
    মাঠের থেকে এল চাষীর দল।
মনে কর্-না উঠল সাঁঝের তারা,
    মনে কর্-না সন্ধে হল যেন।
রাতের বেলা দুপুর যদি হয়
    দুপুর বেলা রাত হবে না কেন॥

সমব্যথী

যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম কুকুর-ছানা
তবে পাছে তোমার পাতে
আমি মুখ দিতে যাই ভাতে
তুমি করতে আমায় মানা?
সত্যি করে বল্‌,
আমায় করিস নে মা, ছল—
বলতে আমায় 'দূর দূর দূর!
কোথা থেকে এল এই কুকুর'?
যা মা, তবে যা মা,
আমায় কোলের থেকে নামা।
আমি খাব না তোর হাতে,
আমি খাব না তোর পাতে॥

যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম তোমার টিয়ে
তবে পাছে যাই, মা, উড়ে
আমায় রাখতে শিকল দিয়ে?
সত্যি ক'রে বল্‌,
আমায় করিস নে মা, ছল—
বলতে আমায় 'হতভাগা পাখি,
শিকল কেটে দিতে চায় রে ফাঁকি'?
তবে নামিয়ে দে মা,
আমায় ভালোবাসিস নে মা।
আমি রব না তোর কোলে,
আমি বনেই যাব চলে॥

বিচিত্র সাধ

আমি যখন পাঠশালাতে যাই
আমাদের এই বাড়ির গলি দিয়ে,
দশটা বেলায় রোজ দেখতে পাই
ফেরিওলা যাচ্ছে ফেরি নিয়ে।
'চুড়ি চা— ই, চুড়ি চাই' সে হাঁকে,
চীনের পুতুল ঝুড়িতে তার থাকে,
যায় সে চলে যে পথে তার খুশি,
যখন খুশি খায় সে বাড়ি গিয়ে।
দশটা বাজে, সাড়ে দশটা বাজে,
নাইকো তাড়া হয় বা পাছে দেরি।
ইচ্ছে করে সেলেট ফেলে দিয়ে
অমনি করে বেড়াই নিয়ে ফেরি॥

আমি যখন হাতে মেখে কালি
ঘরে ফিরি, সাড়ে চারটে বাজে,
কোদাল নিয়ে মাটি কোপায় মালী
বাবুদের ওই ফুল-বাগানের মাঝে।
কেউ তো তারে মানা নাহি করে
কোদাল পাছে পড়ে পায়ের 'পরে।
গায়ে মাথায় লাগছে কত ধুলো,
কেউ তো এসে বকে না তার কাজে।
মা তারে তো পরায় না সাফ জামা,
ধুয়ে দিতে চায় না ধুলোবালি।

ইচ্ছে করে, আমি হতেম যদি
বাবুদের ওই ফুল-বাগানের মালী ॥

একটু বেশি রাত না হতে হতে
মা আমারে ঘুম পাড়াতে চায়,
জানলা দিয়ে দেখি চেয়ে পথে
পাগড়ি প'রে পাহারওলা যায়।
আঁধার গলি, লোক বেশি না চলে,
গ্যাসের আলো মিট্‌মিটিয়ে জ্বলে,
লণ্ঠনটি ঝুলিয়ে নিয়ে হাতে
দাঁড়িয়ে থাকে বাড়ির দরোজায়।
রাত হয়ে যায় দশটা-এগারোটা
কেউ তো কিছু বলে না তার লাগি।
ইচ্ছে করে পাহারওলা হয়ে
গলির ধারে আপন মনে জাগি ॥

মাস্টার-বাবু

আমি আজ কানাই মাস্টার,
পোড়ো মোর বেড়াল-ছানাটি!
আমি ওকে মারি নে মা বেত,
মিছিমিছি বসি নিয়ে কাঠি।
রোজ রোজ দেরি করে আসে,
পড়াতে দেয় না ও তো মন,
ডান পা তুলিয়ে তোলে হাই
যত আমি বলি 'শোন্ শোন্'।
দিনরাত খেলা খেলা খেলা,
লেখায় পড়ায় ভারি হেলা।
আমি বলি 'চ ছ জ ঝ ঞ',
ও কেবল বলে 'মিয়োঁ মিয়োঁ'॥

প্রথম ভাগের পাতা খুলে
আমি ওরে বোঝাই মা, কত—
চুরি করে খাস নে কখনো,
ভালো হোস গোপালের মতো।
যত বলি সব হয় মিছে,
কথা যদি একটিও শোনে—
মাছ যদি দেখেছে কোথাও
কিছুই থাকে না আর মনে।
চড়াই পাখির দেখা পেলে
ছুটে যায় সব পড়া ফেলে।

যত বলি 'চ ছ জ ঝ ঞ',
দুষ্টুমি করে বলে 'মিয়োঁ' ॥

আমি ওরে বলি বার বার,
'পড়ার সময় তুমি পোড়ো,
তার পরে ছুটি হয়ে গেলে
খেলার সময় খেলা কোরো।'
ভালোমানুষের মতো থাকে,
আড়ে আড়ে চায় মুখপানে,
এম্‌নি সে ভান করে যেন
যা বলি বুঝেছে তার মানে।
একটু সুযোগ বোঝে যেই
কোথা যায় আর দেখা নেই।
আমি বলি 'চ ছ জ ঝ ঞ',
ও কেবল বলে 'মিয়োঁ মিয়োঁ' ॥

[আলমোড়া
১৬ শ্রাবণ ১৩১০]

বিজ্ঞ

খুকি তোমার কিচ্ছু বোঝে না মা,
খুকি তোমার ভারি ছেলেমানুষ।
ও ভেবেছে তারা উঠছে বুঝি
আমরা যখন উড়িয়েছিলেম ফানুস।
আমি যখন খাওয়া-খাওয়া খেলি
খেলার থালে সাজিয়ে নিয়ে নুড়ি,
ও ভাবে বা সত্যি খেতে হবে—
মুঠো ক'রে মুখে দেয় মা, পুরি'।
সাম্‌নেতে ওর শিশুশিক্ষা খুলে
যদি বলি 'খুকি, পড়া করো'
দু হাত দিয়ে পাতা ছিঁড়তে বসে—
তোমার খুকির পড়া কেমনতরো।
আমি যদি মুখে কাপড় দিয়ে
আস্তে আস্তে আসি গুড়িগুড়ি
তোমার খুকি অম্‌নি কেঁদে ওঠে,
ও ভাবে বা এল জুজুবুড়ি।
আমি যদি রাগ ক'রে কখনো
মাথা নেড়ে চোখ রাঙিয়ে বকি
তোমার খুকি খিল্‌খিলিয়ে হাসে।
খেলা করছি মনে করে ও কি?
সবাই জানে বাবা বিদেশ গেছে,
তবু যদি বলি 'আসছে বাবা'

তাড়াতাড়ি চার দিকেতে চায়,
তোমার খুকি এম্‌নি বোকা হাবা।
ধোবা এলে পড়াই যখন আমি
টেনে নিয়ে তাদের বাচ্ছা গাধা
আমি বলি 'আমি গুরুমশাই',
ও আমাকে চেঁচিয়ে ডাকে 'দাদা'।

তোমার খুকি চাঁদ ধরতে চায়,
গণেশকে ও বলে যে মা, গানুশ।
তোমার খুকি কিচ্ছু বোঝে না মা,
তোমার খুকি ভারি ছেলেমানুষ॥

[আলমোড়া
১৮ শ্রাবণ ১৩১০]

ব্যাকুল

অমন করে আছিস কেন মা গো,
খোকারে তোর কোলে নিবি না গো?
পা ছড়িয়ে ঘরের কোণে
কী যে ভাবিস আপন-মনে,
এখনো তোর হয় নি তো চুল বাঁধা।
বৃষ্টিতে যায় মাথা ভিজে,
জানলা খুলে দেখিস কী যে,
কাপড়ে যে লাগবে ধুলোকাদা॥

ওই তো গেল চারটে বেজে
ছুটি হল ইস্কুলে যে—
দাদা আসবে মনে নেইকো সিটি!
বেলা অম্‌নি গেল বয়ে,
কেন আছিস অমন হয়ে—
আজকে বুঝি পাস নি বাবার চিঠি?

পেয়াদাটা ঝুলির থেকে
সবার চিঠি গেল রেখে—
বাবার চিঠি রোজ কেন সে দেয় না?
পড়বে বলে আপনি রাখে,
যায় সে চলে ঝুলি কাঁখে—
পেয়াদাটা ভারি দুষ্টু স্যায়না॥

মা গো মা, তুই আমার কথা শোন—

ভাবিস নে মা, অমন সারা ক্ষণ।
কালকে যখন হাটের বারে
বাজার করতে যাবে পারে
কাগজ কলম আনতে বলিস ঝিকে।
দেখো ভুল করব না কোনো,
ক খ থেকে মূর্ধন্য ণ
বাবার চিঠি আমিই দেব লিখে॥

কেন মা, তুই হাসিস কেন।
বাবার মতো আমি যেন
অমন ভালো লিখতে পারি নেকো?
লাইন কেটে মোটা মোটা
বড়ো বড়ো গোটা গোটা
লিখব যখন তখন তুমি দেখো।

চিঠি লেখা হলে পরে
বাবার মতো বুদ্ধি ক'রে
ভাবছ দেব ঝুলির মধ্যে ফেলে?
কক্‌খনো না, আপনি নিয়ে
যাব তোমায় পড়িয়ে দিয়ে—
ভালো চিঠি দেয় না ওরা পেলে॥

[আলমোড়া
২৩ শ্রাবণ ১৩১০]

ছোটোবড়ো

এখনো তো বড়ো হই নি আমি,
ছোটো আছি ছেলেমানুষ ব'লে।
দাদার চেয়ে অনেক মস্ত হব
বড়ো হয়ে বাবার মতো হলে।
দাদা তখন পড়তে যদি না চায়,
পাখির ছানা পোষে কেবল খাঁচায়,
তখন তারে এম্নি বকে দেব!
বলব, 'তুমি চুপটি ক'রে পড়ো।'
বলব, 'তুমি ভারি দুষ্টু ছেলে'—
যখন হব বাবার মতো বড়ো।
তখন নিয়ে দাদার খাঁচাখানা
ভালো ভালো পুষব পাখির ছানা॥

সাড়ে দশটা যখন যাবে বেজে
নাবার জন্যে করব না তো তাড়া।
ছাতা একটা ঘাড়ে ক'রে নিয়ে
চটি পায়ে বেড়িয়ে আসব পাড়া।

গুরুমশায় দাওয়ায় এলে পরে
চৌকি এনে দিতে বলব ঘরে;
তিনি যদি বলেন, 'সেলেট কোথা—
দেরি হচ্ছে, বসে পড়া করো'
আমি বলব, 'খোকা তো আর নেই,
হয়েছি যে বাবার মতো বড়ো।'

গুরুমশায় শুনে তখন কবে,
'বাবুমশায়, আসি এখন তবে।'

খেলা করতে নিয়ে যেতে মাঠে
ভুলু যখন আসবে বিকেল বেলা
আমি তাকে ধমক দিয়ে কব,
'কাজ করছি, গোল কোরো না মেলা।'
রথের দিনে খুব যদি ভিড় হয়
একলা যাব, করব না তো ভয়;
মামা যদি বলেন ছুটে এসে
'হারিয়ে যাবে, আমার কোলে চড়ো'
বলব আমি, 'দেখছ না কি মামা,
হয়েছি যে বাবার মতো বড়ো।'
দেখে দেখে মামা বলবে, 'তাই তো,
খোকা আমার সে খোকা আর নাই তো।'

আমি যেদিন প্রথম বড়ো হব
মা সেদিনে গঙ্গাস্নানের পরে
আসবে যখন খিড়কি-দুয়োর দিয়ে
ভাববে, 'কেন গোল শুনি নে ঘরে।'
তখন আমি চাবি খুলতে শিখে
যত ইচ্ছে টাকা দিচ্ছি ঝিকে,
মা দেখে তাই বলবে তাড়াতাড়ি,
'খোকা, তোমার খেলা কেমনতরো!'

আমি বলব, 'মাইনে দিচ্ছি আমি,
হয়েছি যে বাবার মতো বড়ো।
ফুরোয় যদি টাকা, ফুরোয় খাবার,
যত চাই মা, এনে দেব আবার।'

আশ্বিনেতে পুজোর ছুটি হবে,
মেলা বসবে গাজন-তলার হাটে,
বাবার নৌকো কত দূরের থেকে
লাগবে এসে বাবুগঞ্জের ঘাটে।
বাবা মনে ভাববে সোজাসুজি
খোকা তেমনি খোকাই আছে বুঝি—
ছোটো ছোটো রঙিন জামা জুতো
কিনে এনে বলবে আমায় 'পরো'।
আমি বলব, 'দাদা পরুক এসে,
আমি এখন তোমার মতো বড়ো।
দেখছ না কি যে ছোটো মাপ জামার
পরতে গেলে আঁট হবে যে আমার।'

[আলমোড়া
২৮ শ্রাবণ ১৩১০]

সমালোচক

বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে
কিছুই বোঝা যায় না লেখেন কী যে!
সেদিন পড়ে শোনাচ্ছিলেন তোরে,
বুঝেছিলি?— বল্ মা, সত্যি ক'রে।
এমন লেখায় তবে
বল্ দেখি কী হবে॥

তোর মুখে মা যেমন কথা শুনি
তেমন কেন লেখেন নাকো উনি।
ঠাকুরমা কি বাবাকে কক্‌খনো
রাজার কথা শোনায় নিকো কোনো?
সে-সব কথাগুলি
গেছেন বুঝি ভুলি?

স্নান করতে বেলা হল দেখে
তুমি কেবল যাও মা, ডেকে ডেকে—
খাবার নিয়ে তুমি বসেই থাকো,
সে কথা তাঁর মনেই থাকে নাকো।
করেন সারা বেলা
লেখা-লেখা খেলা॥

বাবার ঘরে আমি খেলতে গেলে
তুমি আমায় বল 'দুষ্টু ছেলে'!

বকো আমায় গোল করলে পরে,
'দেখছিস নে লিখছে বাবা ঘরে।'
বল্‌ তো, সত্যি বল্‌,
লিখে কী হয় ফল॥

আমি যখন বাবার খাতা টেনে
লিখি বসে দোয়াত কলম এনে—
ক খ গ ঘ ঙ হ্‌ য ব র,
আমার বেলা কেন মা, রাগ কর!
বাবা যখন লেখে
কথা কও না দেখে॥

বড়ো বড়ো রুল-কাটা কাগজ
নষ্ট বাবা করেন না কি রোজ?
আমি যদি নৌকো করতে চাই
অম্‌নি বল 'নষ্ট করতে নাই'
সাদা কাগজ কালো
করলে বুঝি ভালো?

বীরপুরুষ

মনে করো, যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পাল্কিতে মা চ'ড়ে
দরজাদুটো একটুকু ফাঁক ক'রে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে ॥

সন্ধে হল, সূর্য নামে পাটে,
এলেম যেন জোড়াদিঘির মাঠে।
ধূ ধূ করে যে দিক-পানে চাই,
কোনোখানে জনমানব নাই—
তুমি যেন আপন মনে তাই
ভয় পেয়েছ; ভাবছ, 'এলেম কোথা!'
আমি বলছি, 'ভয় কোরো না মা গো,
ওই দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা।'

চোর-কাঁটাতে মাঠ রয়েছে ঢেকে,
মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেঁকে।
গোরু বাছুর নেইকো কোনোখানে,
সন্ধে হতেই গেছে গাঁয়ের পানে—
আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে,
অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো।

তুমি যেন বললে আমায় ডেকে,
'দিঘির ধারে ওই যে কিসের আলো!'

এমন সময় 'হাঁরে রে-রে-রে-রে'
ওই যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে।
তুমি ভয়ে পাল্কিতে এক কোণে
ঠাকুর দেবতা স্মরণ করছ মনে,
বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে
পাল্কি ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো।
আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে,
'আমি আছি, ভয় কেন মা করো!'

হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল,
কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল।
আমি বলি, 'দাঁড়া, খবরদার!
এক পা কাছে আসিস যদি আর—
এই চেয়ে দেখ্ আমার তলোয়ার,
টুকরো করে দেব তোদের সেরে।'
শুনে তারা লম্ফ দিয়ে উঠে
চেঁচিয়ে উঠল 'হাঁরে রে-রে রে-রে'॥

তুমি বললে, 'যাস নে খোকা ওরে।'
আমি বলি, 'দেখো-না চুপ ক'রে।'
ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝন্‌ঝনিয়ে বাজে—

কী ভয়ানক লড়াই হল মা যে
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে,
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা॥

এত লোকের সঙ্গে লড়াই ক'রে
ভাবছ খোকা গেলই বুঝি ম'রে।
আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
বলছি এসে, 'লড়াই গেছে থেমে।'
তুমি শুনে পাল্কি থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে—
বলছ, 'ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল!
কী দুর্দশাই হত তা না হলে।'

রোজ কত কী ঘটে যাহা-তাহা—
এমন কেন সত্যি হয় না আহা।
ঠিক যেন এক গল্প হত তবে,
শুনত যারা অবাক হত সবে—
দাদা বলত, 'কেমন ক'রে হবে,
খোকার গায়ে এত কি জোর আছে।'
পাড়ার লোকে সবাই বলত শুনে,
'ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে।'

রাজার বাড়ি

আমার রাজার বাড়ি কোথায় কেউ জানে না সে তো!
সে বাড়ি কি থাকত যদি লোকে জানতে পেত।
রুপো দিয়ে দেয়াল গাঁথা, সোনা দিয়ে ছাত,
থাকে থাকে সিঁড়ি ওঠে সাদা হাতির দাঁত।
সাত-মহলা কোঠায় সেথা থাকেন সুয়োরানী,
সাত রাজার ধন মানিক-গাঁথা গলার মালাখানি।
আমার রাজার বাড়ি কোথায় শোন্ মা, কানে কানে—
ছাদের পাশে তুল্‌সী গাছের টব আছে যেইখানে ॥

রাজকন্যা ঘুমোয় কোথা সাত সাগরের পারে,
আমি ছাড়া আর কেহ তো পায় না খুঁজে তারে।
দু হাতে তার কাঁকন দুটি, দুই কানে দুই দুল,
খাটের থেকে মাটির 'পরে লুটিয়ে পড়ে চুল।
ঘুম ভেঙে তার যাবে যখন সোনার কাঠি ছুঁয়ে
হাসিতে তার মানিকগুলি পড়বে ঝ'রে ভুঁয়ে।
রাজকন্যা ঘুমোয় কোথা শোন্ মা, কানে কানে—
ছাদের পাশে তুল্‌সী গাছের টব আছে যেইখানে ॥

তোমরা যখন ঘাটে চলো স্নানের বেলা হলে
আমি তখন চুপি চুপি যাই সে ছাদে চলে।

পাঁচিল বেয়ে ছায়াখানি পড়ে মা, যেই কোণে
সেইখানেতে পা ছড়িয়ে বসি আপন-মনে।
সঙ্গে শুধু নিয়ে আসি মিনি বেড়ালটাকে,
সেও জানে নাপিত ভায়া কোন্‌খানেতে থাকে।
জানিস নাপিত-পাড়া কোথায়? শোন্‌ মা, কানে কানে—
ছাদের পাশে তুল্‌সী গাছের টব আছে যেইখানে ॥

মাঝি

আমার যেতে ইচ্ছে করে
নদীটির ওই পারে—
যেথায় ধারে ধারে
বাঁশের খোঁটায় ডিঙি নৌকো
বাঁধা সারে সারে।
কৃষাণেরা পার হয়ে যায়
লাঙল কাঁধে ফেলে,
জাল টেনে নেয় জেলে,
গোরু মহিষ সাঁৎরে নিয়ে
যায় রাখালের ছেলে।
সন্ধে হলে যেখান থেকে
সবাই ফেরে ঘরে,
শুধু রাতদুপরে
শেলায়গুলো ডেকে ওঠে
ঝাউডাঙাটার 'পরে।
মা, যদি হও রাজি,
বড়ো হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি ॥

শুনেছি ওর ভিতর দিকে
আছে জলার মতো।
বর্ষা হলে গত
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে সেথায়

চখাচখী যত।
তারি ধারে ঘন হয়ে
জন্মেছে সব শর,
মানিক-জোড়ের ঘর,
কাদাখোঁচা পায়ের চিহ্ন
আঁকে পাঁকের 'পর।
সন্ধ্যা হলে কত দিন মা,
দাঁড়িয়ে ছাদের কোণে
দেখেছি এক মনে—
চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়ে
সাদা কাশের বনে।
মা, যদি হও রাজি,
বড়ো হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি॥

এ-পার ও-পার দুই পারেতেই
যাব নৌকো বেয়ে।
যত ছেলে মেয়ে
স্নানের ঘাটে থেকে আমায়
দেখবে চেয়ে চেয়ে।
সূর্য যখন উঠবে মাথায়,
অনেক বেলা হলে,
আসব তখন চলে
'বড়ো খিদে পেয়েছে গো
খেতে দাও মা' বলে।

আবার আমি আসব ফিরে
আঁধার হলে সাঁঝে
তোমার ঘরের মাঝে।
বাবার মতো যাব না মা,
বিদেশে কোন্ কাজে।
মা, যদি হও রাজি,
বড়ো হলে আমি হব
খেয়াঘাটের মাঝি॥

[আলমোড়া
১৫ শ্রাবণ ১৩১০]

নৌকাযাত্রা

মধু মাঝির ওই যে নৌকোখানা
বাঁধা আছে রাজগঞ্জের ঘাটে—
কারো কোনো কাজে লাগছে না তো,
বোঝাই করা আছে কেবল পাটে।
আমায় যদি দেয় তারা নৌকাটি
আমি তবে একশোটা দাঁড় আঁটি,
পাল তুলে দিই চারটে পাঁচটা ছটা—
মিথ্যে ঘুরে বেড়াই নাকো হাটে,
আমি কেবল যাই একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার ॥

তখন তুমি কেঁদো না মা, যেন
ব'সে ব'সে একলা ঘরের কোণে।
আমি তো মা, যাচ্ছি নেকো চ'লে
রামের মতো চোদ্দ বছর বনে।
আমি যাব রাজপুত্র হয়ে
নৌকো-ভরা সোনা মানিক বয়ে,
আশুকে আর শ্যামকে নেব সাথে—
আমরা শুধু যাব মা, তিন জনে।
আমি কেবল যাব একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার ॥

ভোরের বেলা দেব নৌকো ছেড়ে,
দেখতে দেখতে কোথায় যাব ভেসে।

দুপুর বেলা তুমি পুকুর-ঘাটে,
আমরা তখন নতুন রাজার দেশে।
পেরিয়ে যাব তির্‌পুর্নির ঘাট,
পেরিয়ে যাব তেপান্তরের মাঠ,
ফিরে আসতে সন্ধে হয়ে যাবে—
গল্প বলব তোমার কোলে এসে।
আমি কেবল যাব একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার॥

ছুটির দিনে

ওই দেখো মা, আকাশ ছেয়ে
মিলিয়ে এল আলো,
আজকে আমার ছুটোছুটি
লাগল না আর ভালো।
ঘণ্টা বেজে গেল কখন
অনেক হল বেলা—
তোমায় মনে পড়ে গেল,
ফেলে এলেম খেলা।
আজকে আমার ছুটি, আমার
শনিবারের ছুটি—
কাজ যা আছে সব রেখে আয়,
মা, তোর পায়ে লুটি।
দ্বারের কাছে এইখানে বোস,
এই হেথা চৌকাঠ—
বল্ আমারে কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ॥

ওই দেখো মা, বর্ষা এল
ঘনঘটায় ঘিরে,
বিজুলি ধায় এঁকেবেঁকে
আকাশ চিরে চিরে।
দেব্‌তা যখন ডেকে ওঠে,
থর্‌থরিয়ে কেঁপে

ভয় করতেই ভালোবাসি
তোমায় বুকে চেপে।
ঝুপ্‌ঝুপিয়ে বৃষ্টি যখন
বাঁশের বনে পড়ে
কথা শুনতে ভালোবাসি
ব'সে কোণের ঘরে।
ওই দেখো মা, জানলা দিয়ে
আসে জলের ছাট—
বল্‌ গো আমায় কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ ॥

কোন্‌ সাগরের তীরে, মা গো,
কোন্‌ পাহাড়ের পারে,
কোন্‌ রাজাদের দেশে, মা গো,
কোন্‌ নদীটির ধারে।
কোনোখানে আল বাঁধা তার
নাই ডাইনে বাঁয়ে?
পথ দিয়ে তার সন্ধেবেলায়
পৌঁছে না কেউ গাঁয়ে?
সারা দিন কি ধূ ধূ করে
শুকনো ঘাসের জমি।
একটি গাছে থাকে শুধু
ব্যাঙ্গমা-বেঙ্গমি?
সেখান দিয়ে কাঠকুড়ুনি
যায় না নিয়ে কাঠ?

বল্ গো আমায় কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ ॥

এম্‌নিতরো মেঘ করেছে
সারা আকাশ ব্যেপে,
রাজপুত্তুর যাচ্ছে মাঠে
একলা ঘোড়ায় চেপে।
গজমোতির মালাটি তার
বুকের 'পরে নাচে—
রাজকন্যা কোথায় আছে
খোঁজ পেলে কার কাছে?
মেঘে যখন ঝিলিক মারে
আকাশের এক কোণে
দুয়োরানী-মায়ের কথা
পড়ে না তার মনে?
দুখিনী মা গোয়াল-ঘরে
দিচ্ছে এখন ঝাঁট—
রাজপুত্তুর চলে যে কোন্
তেপান্তরের মাঠ ॥

ওই দেখো মা, গাঁয়ের পথে
লোক নেইকো মোটে,
রাখাল-ছেলে সকাল ক'রে
ফিরেছে আজ গোঠে।
আজকে দেখো রাত হয়েছে

দিন না যেতে যেতে,
কৃষাণেরা বসে আছে
দাওয়ায় মাদুর পেতে।
আজকে আমি লুকিয়েছি মা,
পুঁথিপত্তর যত—
পড়ার কথা আজ বোলো না
যখন বাবার মতো
বড়ো হব, তখন আমি
পড়ব প্রথম পাঠ—
আজ বলো মা, কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ॥

[আলমোড়া
১৩ শ্রাবণ ১৩১০]

বনবাস

বাবা যদি রামের মতো
পাঠায় আমায় বনে,
যেতে আমি পারি নে কি
তুমি ভাবছ মনে?
চোদ্দ বছর ক'দিনে হয়
জানি নে মা, ঠিক—
দণ্ডক-বন আছে কোথায়
ওই মাঠে কোন্ দিক।
কিন্তু আমি পারি যেতে
ভয় করি নে তাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে॥

বনের মধ্যে গাছের ছায়ায়
বেঁধে নিতেম ঘর—
সামনে দিয়ে বইত নদী,
পড়ত বালির চর।
ছোটো একটি থাকত ডিঙি
পারে যেতেম বেয়ে—
হরিণ চ'ড়ে বেড়ায় সেথা,
কাছে আসত ধেয়ে।
গাছের পাতা খাইয়ে দিতেম
আমি নিজের হাতে—

লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে ॥

কত যে গাছ ছেয়ে থাকত
কত রকম ফুলে,
মালা গেঁথে প'রে নিতেম
জড়িয়ে মাথার চুলে।
নানা রঙের ফলগুলি সব
ভুঁয়ে পড়ত পেকে,
ঝুড়ি ভ'রে ভ'রে এনে
ঘরে দিতেম রেখে।
খিদে পেলে দুই ভায়েতে
খেতেম পদ্মপাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে ॥

রোদের বেলায় অশথ-তলায়
ঘাসের 'পরে আসি
রাখাল-ছেলের মতো কেবল
বাজাই বসে বাঁশি।
ডালের 'পরে ময়ূর থাকে,
পেখম পড়ে ঝুলে—
কাঠবিড়ালি ছুটে বেড়ায়
ন্যাজটি পিঠে তুলে।
কখন আমি ঘুমিয়ে যেতেম

দুপুর বেলার তাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে ॥

সন্ধেবেলায় কুড়িয়ে আনি
শুকোনো ডালপালা,
বনের ধারে বসে থাকি
আগুন হলে জ্বালা।
পাখিরা সব বাসায় ফেরে,
দূরে শেয়াল ডাকে—
সন্ধেতারা দেখা যে যায়
ডালের ফাঁকে ফাঁকে।
মায়ের কথা মনে করি
বসে আঁধার রাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে ॥

ঠাকুরদাদার মতো বনে
আছেন ঋষি মুনি,
তাঁদের পায়ে প্রণাম ক'রে
গল্প অনেক শুনি।
রাক্ষসেরে ভয় করি নে,
আছে গুহক মিতা—
রাবণ আমার কী করবে মা,
নেই তো আমার সীতা।

হনুমানকে যত্ন ক'রে
খাওয়াই দুধে ভাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে॥

মা গো, আমায় দে-না কেন
একটি ছোটো ভাই—
দুইজনেতে মিলে আমরা
বনে চলে যাই।
আমাকে মা, শিখিয়ে দিবি
রাম-যাত্রার গান—
মাথায় বেঁধে দিবি চুড়ো,
হাতে ধনুক-বাণ।
চিত্রকূটের পাহাড়ে যাই
এম্‌নি বরষাতে—
লক্ষ্মণ ভাই যদি আমার
থাকত সাথে সাথে॥

জ্যোতিষশাস্ত্র

আমি শুধু বলেছিলেম,
'কদম গাছের ডালে
পূর্ণিমা চাঁদ আট্‌কা পড়ে
যখন সন্ধেকালে
তখন কি কেউ তারে
ধরে আনতে পারে!'
শুনে দাদা হেসে কেন
বললে আমায়, 'খোকা,
তোর মতো আর দেখি নাইকো বোকা।
চাঁদ যে থাকে অনেক দূরে,
কেমন করে ছুঁই।'
আমি বলি, 'দাদা, তুমি
জান না কিচ্ছুই।
মা আমাদের হাসে যখন
ওই জানলার ফাঁকে
তখন তুমি বলবে কি, মা
অনেক দূরে থাকে!'
তবু দাদা বলে আমায়, 'খোকা,
তোর মতো আর দেখি নাই তো বোকা।'
দাদা বলে, 'পাবি কোথায়
অত বড়ো ফাঁদ!'
আমি বলি, 'কেন দাদা,
ওই তো ছোটো চাঁদ,

দুটি মুঠোয় ওরে
আনতে পারি ধরে।'
শুনে দাদা হেসে কেন
বললে আমায়, 'খোকা,
তোর মতো আর দেখি নাই তো বোকা।
চাঁদ যদি এই কাছে আসত
দেখতে কতবড়ো।'
আমি বলি, 'কী তুমি ছাই
ইস্কুলে যে পড়ো!
মা আমাদের চুমো খেতে
মাথা করে নিচু,
তখন কি মার মুখটি দেখায়
মস্ত বড়ো কিছু।'
তবু দাদা বলে আমায়, 'খোকা,
তোর মতো আর দেখি নাই তো বোকা।'

বৈজ্ঞানিক

যেম্‌নি মা গো, গুরু গুরু
মেঘের পেলে সাড়া
যেম্‌নি এল আষাঢ় মাসে
বৃষ্টিজলের ধারা,
পুবে হাওয়া মাঠ পেরিয়ে
যেম্‌নি পড়ল আসি
বাঁশ-বাগানে সোঁ সোঁ ক'রে
বাজিয়ে দিয়ে বাঁশি,
অম্‌নি দেখ্‌ মা, চেয়ে—
সকল মাটি ছেয়ে
কোথা থেকে উঠল যে ফুল
এত রাশি রাশি ॥

তুই যে ভাবিস ওরা কেবল
অম্‌নি যেন ফুল,
আমার মনে হয় মা, তোদের
সেটা ভারি ভুল।
ওরা সব ইস্‌কুলের ছেলে,
পুঁথিপত্র কাঁখে—
মাটির নীচে ওরা ওদের
পাঠশালাতে থাকে।
ওরা পড়া করে

দুয়োর-বন্ধ ঘরে,
খেলতে চাইলে গুরুমশায়
দাঁড় করিয়ে রাখে ॥

বোশেখ জষ্ঠি মাসকে ওরা
দুপুর বেলা কয়,
আষাঢ় হলে আঁধার ক'রে
বিকেল ওদের হয়।
ডালপালারা শব্দ করে
ঘন বনের মাঝে,
মেঘের ডাকে তখন ওদের
সাড়ে চারটে বাজে।
অমনি ছুটি পেয়ে
আসে সবাই ধেয়ে,
হলদে রাঙা সবুজ সাদা
কত রকম সাজে ॥

জানিস মা গো? ওদের যেন
আকাশেতেই বাড়ি,
রাত্রে যেথায় তারাগুলি
দাঁড়ায় সারি সারি।
দেখিস নে মা? বাগান ছেয়ে
ব্যস্ত ওরা কত!

বুঝতে পারিস কেন ওদের
তাড়াতাড়ি অত?
জানিস কি কার কাছে
হাত বাড়িয়ে আছে।
মা কি ওদের নেইকো ভাবিস
আমার মায়ের মতো॥

মাতৃবৎসল

মেঘের মধ্যে মা গো, যারা থাকে
তারা আমায় ডাকে আমায় ডাকে।
বলে, 'আমরা কেবল করি খেলা
সকাল থেকে দুপুর সন্ধেবেলা।
সোনার খেলা খেলি আমরা ভোরে,
রুপোর খেলা খেলি চাঁদকে ধ'রে।'
আমি বলি, 'যাব কেমন ক'রে?'
তারা বলে, 'এসো মাঠের শেষে।
সেইখানেতে দাঁড়াবে হাত তুলে,
আমরা তোমায় নেব মেঘের দেশে।'
আমি বলি, 'মা যে আমার ঘরে
বসে আছে চেয়ে আমার তরে,
তারে ছেড়ে থাকব কেমন করে?'
শুনে তারা হেসে যায় মা, ভেসে।
তার চেয়ে মা, আমি হব মেঘ,
তুমি যেন হবে আমার চাঁদ—
দু হাত দিয়ে ফেলব তোমায় ঢেকে,
আকাশ হবে এই আমাদের ছাদ ॥

ঢেউয়ের মধ্যে, মা গো, যারা থাকে
তারা আমায় ডাকে আমায় ডাকে।
বলে, 'আমরা কেবল করি গান
সকাল থেকে সকল দিনমান।'

তারা বলে, 'কোন্ দেশে যে ভাই,
আমরা চলি ঠিকানা তার নাই।'
আমি বলি, 'কেমন করে যাই!'
তারা বলে, 'এসো ঘাটের শেষে।
সেইখানেতে দাঁড়াবে চোখ বুজে,
আমরা তোমায় নেব ঢেউয়ের দেশে।'
আমি বলি, 'মা যে চেয়ে থাকে,
সন্ধে হলে নাম ধরে মোর ডাকে,
কেমন করে ছেড়ে থাকব তাকে।'
শুনে তারা হেসে যায় মা, ভেসে।
তার চেয়ে মা, আমি হব ঢেউ,
তুমি হবে অনেক দূরের দেশ—
লুটিয়ে আমি পড়ব তোমার কোলে,
কেউ আমাদের পাবে না উদ্দেশ॥

লুকোচুরি

আমি যদি দুষ্টুমি করে
চাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফুটি
ভোরের বেলা, মা গো, ডালের 'পরে
কচি পাতায় করি লুটোপুটি,
তবে তুমি আমার কাছে হারো,
তখন কি মা, চিনতে আমায় পারো।
তুমি ডাকো, 'খোকা, কোথায় ওরে।'
আমি শুধু হাসি চুপটি ক'রে ॥

যখন তুমি থাকবে যে কাজ নিয়ে
সবই আমি দেখব নয়ন মেলে—
স্নানটি ক'রে চাঁপার তলা দিয়ে
আসবে তুমি পিঠেতে চুল ফেলে।
এখান দিয়ে পুজোর ঘরে যাবে,
দূরের থেকে ফুলের গন্ধ পাবে—
তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে
তোমার খোকার গায়ের গন্ধ আসে ॥

দুপুর বেলা মহাভারত হাতে
বসবে তুমি সবার খাওয়া হলে,
গাছের ছায়া ঘরের জানালাতে
পড়বে এসে তোমার পিঠে কোলে।
আমি আমার ছোট্ট ছায়াখানি

দোলাব তোর বইয়ের 'পরে আনি—
তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে
তোমার চোখে খোকার ছায়া ভাসে ॥

সন্ধেবেলায় প্রদীপখানি জ্বেলে
যখন তুমি যাবে গোয়াল-ঘরে
তখন আমি ফুলের খেলা খেলে
টুপ্ করে মা, পড়ব ভুঁয়ে ঝরে।
আবার আমি তোমার খোকা হব,
'গল্প বলো' তোমায় গিয়ে কব।
তুমি বলবে, 'দুষ্টু, ছিলি কোথা?'
আমি বলব, 'বলব না সে কথা।'

দুঃখহারী

মনে করো তুমি থাকবে ঘরে,
আমি যেন যাব দেশান্তরে।
ঘাটে আমার বাঁধা আছে তরী,
জিনিস-পত্র নিয়েছি সব ভরি—
ভালো করে দেখ্ তো মনে করি
কী এনে মা, দেব তোমার তরে ॥

চাস কি মা, তুই এত এত সোনা—
সোনার দেশে করব আনাগোনা।
সোনামতী নদী-তীরের কাছে
সোনার ফসল মাঠে ফ'লে আছে,
সোনার চাঁপা ফোটে সেথায় গাছে—
না কুড়িয়ে আমি তো ফিরব না ॥

পরতে কি চাস মুক্তো গেঁথে হারে—
জাহাজ বেয়ে যাব সাগর-পারে।
সেখানে, মা, সকাল বেলা হলে
ফুলের 'পরে মুক্তোগুলি দোলে—
টুপ্‌টুপিয়ে পড়ে ঘাসের কোলে—
যত পারি আনব ভারে ভারে ॥

দাদার জন্য আনব মেঘে ওড়া
পক্ষিরাজের বাচ্ছা দুটি ঘোড়া।

বাবার জন্যে আনব আমি তুলি
কনক-লতার চারা অনেকগুলি—
তোর তরে মা, দেব কৌটা খুলি
সাত রাজার ধন মানিক একটি জোড়া ॥

[আলমোড়া
৩০? শ্রাবণ ১৩১০]

বিদায়

তবে আমি যাই গো তবে যাই।
ভোরের বেলা শূন্য কোলে
ডাকবি যখন খোকা ব'লে
বলব আমি, 'নাই সে খোকা নাই।'
মা গো, যাই ॥

হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে
যাব মা, তোর বুকে বয়ে—
ধরতে আমায় পারবি নে তো হাতে।
জলের মধ্যে হব মা, ঢেউ—
জানতে আমায় পারবে না কেউ—
স্নানের বেলা খেলব তোমার সাথে ॥

বাদলা যখন পড়বে ঝরে
রাতে শুয়ে ভাববি মোরে,
ঝর্‌ঝরানি গান গাব ওই বনে।
জানলা দিয়ে মেঘের থেকে
চমক মেরে যাব দেখে—
আমার হাসি পড়বে কি তোর মনে ॥

খোকার লাগি তুমি মা গো,
অনেক রাতে যদি জাগ
তারা হয়ে বলব তোমায় 'ঘুমো'।

তুই ঘুমিয়ে পড়লে পরে
জ্যোৎস্না হয়ে ঢুকব ঘরে,
চোখে তোমার খেয়ে যাব চুমো ॥

স্বপন হয়ে আঁখির ফাঁকে
দেখতে আমি আসব মাকে,
যাব তোমার ঘুমের মধ্যিখানে।
জেগে তুমি মিথ্যে আশে
হাত বুলিয়ে দেখবে পাশে,
মিলিয়ে যাব কোথায় কে তা জানে ॥

পুজোর সময় যত ছেলে
আঙিনায় বেড়াবে খেলে,
বলবে 'খোকা নেই রে ঘরের মাঝে'—
আমি তখন বাঁশির সুরে
আকাশ বেয়ে ঘুরে ঘুরে
তোমার সাথে ফিরব সকল কাজে ॥

পুজোর কাপড় হাতে ক'রে
মাসি যদি শুধায় তোরে
'খোকা তোমার কোথায় গেল চলে'
বলিস, 'খোকা সে কি হারায়,
আছে আমার চোখের তারায়,
মিলিয়ে আছে আমার বুকে কোলে।'

[আলমোড়া
৩১ শ্রাবণ ১৩১০]

নদী

ওরে তোরা কি জানিস কেউ
জলে কেন ওঠে এত ঢেউ।
ওরা দিবস রজনী নাচে,
তাহা শিখেছে কাহার কাছে।
শোন্ চলচল্ ছলছল্
সদাই গাহিয়া চলেছে জল।
ওরা কারে ডাকে বাহু তুলে,
ওরা কার কোলে ব'সে দুলে।
সদা হেসে করে লুটোপুটি,
চলে কোন্‌খানে ছুটোছুটি,
ওরা সকলের মন তুষি
আছে আপনার মনে খুশি ॥

আমি বসে বসে তাই ভাবি
নদী কোথা হতে এল নাবি।
কোথায় পাহাড় সে কোন্‌খানে,
তাহার নাম কি কেহই জানে।
কেহ যেতে পারে তার কাছে?
সেথায় মানুষ কি কেউ আছে?
সেথা নাহি তরু, নাহি ঘাস,
নাহি পশুপাখিদের বাস।
সেথা শবদ কিছু না শুনি—
পাহাড় বসে আছে মহামুনি,

তাহার মাথার উপরে শুধু
সাদা বরফ করিছে ধূধূ।
সেথা রাশি রাশি মেঘ যত
থাকে ঘরের ছেলের মতো।
শুধু হিমের মতন হাওয়া
সেথায় করে সদা আসা-যাওয়া।
শুধু সারা রাত তারাগুলি
তারে চেয়ে দেখে আঁখি খুলি।
শুধু ভোরের কিরণ এসে
তারে মুকুট পরায় হেসে॥

সেই নীল আকাশের পায়ে
সেথা কোমল মেঘের গায়ে
সেথা সাদা বরফের বুকে
নদী ঘুমায় স্বপনসুখে।
কবে মুখে তার রোদ লেগে
নদী আপনি উঠিল জেগে—
কবে একদা রোদের বেলা
তাহার মনে পড়ে গেল খেলা।
সেথায় একা ছিল দিন-রাতি,
কেহই ছিল না খেলার সাথি।
সেথায় কথা নাহি কারো ঘরে,
সেথায় গান কেহ নাহি করে।
তাই ঝুরুঝুরু ঝিরিঝিরি
নদী বাহিরিল ধীরি ধীরি।

মনে ভাবিল, যা আছে ভবে
সবই দেখিয়া লইতে হবে॥

নীচে পাহাড়ের বুক জুড়ে
গাছ উঠেছে আকাশ ফুঁড়ে।
তারা বুড়ো বুড়ো তরু যত,
তাদের বয়স কে জানে কত!
তাদের খোপে খোপে গাঁঠে গাঁঠে
পাখি বাসা বাঁধে কুটো-কাঠে।
তারা ডাল তুলে কালো কালো
আড়াল করেছে রবির আলো।
তাদের শাখায় জটার মতো
ঝুলে পড়েছে শ্যাওলা যত।
তারা মিলায়ে মিলায়ে কাঁধ
যেন পেতেছে আঁধার-ফাঁদ।
তাদের তলে তলে নিরিবিলি
নদী হেসে চলে খিলিখিলি।
তারে কে পারে রাখিতে ধরে,
সে যে ছুটোছুটি যায় সরে।
সে যে সদা খেলে লুকোচুরি,
তাহার পায়ে পায়ে বাজে নুড়ি।
পথে শিলা আছে রাশি রাশি,
তাহা ঠেলে চলে হাসি হাসি।
পাহাড় যদি থাকে পথ জুড়ে
নদী হেসে যায় বেঁকেচুরে।

সেথায় বাস করে শিঙ-তোলা
যত বুনো ছাগ দাড়ি-ঝোলা।
সেথায় হরিণ রোঁয়ায় ভরা
তারা কারেও দেয় না ধরা।
সেথায় মানুষ নূতনতরো,
তাদের শরীর কঠিন বড়ো।
তাদের চোখদুটো নয় সোজা,
তাদের কথা নাহি যায় বোঝা।
তারা পাহাড়ের ছেলে মেয়ে
সদাই কাজ করে গান গেয়ে।
তারা সারা দিনমান খেটে
আনে বোঝা-ভরা কাঠ কেটে।
তারা চড়িয়া শিখর-'পরে
বনের হরিণ শিকার করে॥

নদী যত আগে আগে চলে
ততই সাথি জোটে দলে দলে।
তারা তারি মতো, ঘর হতে
সবাই বাহির হয়েছে পথে।
পায়ে ঠুনুঠুনু বাজে নুড়ি,
যেন বাজিতেছে মল চুড়ি।
গায়ে আলো করে ঝিকিঝিক,
যেন পরেছে হীরার চিক।
মুখে কলকল কত ভাষে
এত কথা কোথা হতে আসে।

শেষে সখীতে সখীতে মেলি
হেসে গায়ে গায়ে হেলাহেলি।
শেষে কোলাকুলি কলরবে
তারা এক হয়ে যায় সবে।
তখন কলকল ছুটে জল,
কাঁপে টলমল ধরাতল—
কোথাও নীচে পড়ে ঝরঝর,
পাথর কেঁপে ওঠে থরথর—
শিলা খান খান যায় টুটে,
নদী চলে পথ কেটে-কুটে।
ধারে গাছগুলো বড়ো বড়ো
তারা হয়ে পড়ে পড়ো-পড়ো,
কত বড়ো পাথরের চাপ
জলে খ'সে পড়ে ঝুপ ঝাপ।
তখন মাটি-গোলা ঘোলা জলে
ফেনা ভেসে যায় দলে দলে।
জলে পাক ঘুরে ঘুরে ওঠে,
যেন পাগলের মতো ছোটে॥

শেষে পাহাড় ছাড়িয়া এসে
নদী পড়ে বাহিরের দেশে।
হেথা যেখানে চাহিয়া দেখে
চোখে সকলই নূতন ঠেকে।
হেথা চারি দিকে খোলা মাঠ,
হেথা সমতল পথ ঘাট।

কোথাও চাষীরা করিছে চাষ,
কোথাও গোরুতে খেতেছে ঘাস।
কোথাও বৃহৎ অশথ গাছে
পাখি শিস দিয়ে দিয়ে নাচে।
কোথাও রাখাল-ছেলের দলে
খেলা করিছে গাছের তলে।
কোথাও নিকটে গ্রামের মাঝে
লোকে ফিরিছে নানান কাজে।
কোথাও বাধা কিছু নাহি পথে,
নদী চলেছে আপন মতে।
পথে বরষার জলধারা
আসে চারি দিক হতে তারা।
নদী দেখিতে দেখিতে বাড়ে,
এখন কে রাখে ধরিয়া তারে॥

তাহার দুই কূলে উঠে ঘাস,
সেথায় যতেক বকের বাস।
সেথা মহিষের দল থাকে,
তারা লুটায় নদীর পাঁকে।
যত বুনো বরা সেথা ফেরে,
তারা দাঁত দিয়ে মাটি চেরে।
সেথা শেয়াল লুকায়ে থাকে,
রাতে 'হুয়া হুয়া' ক'রে ডাকে।
দেখে এইমতো কত দেশ
কেবা গণিয়া করিবে শেষ।

কোথাও কেবল বালির ডাঙা,
কোথাও মাটিগুলো রাঙা-রাঙা।
কোথাও ধারে ধারে উঠে বেত,
কোথাও দু ধারে গমের খেত।
কোথাও ছোটোখাটো গ্রামখানি,
কোথাও মাথা তোলে রাজধানী—
সেথায় নবাবের বড়ো কোঠা,
তারি পাথরের থাম মোটা,
তারি ঘাটের সোপান যত
জলে নামিয়াছে শত শত।
কোথাও সাদা পাথরের পুলে
নদী বাঁধিয়াছে দুই কূলে।
কোথাও লোহার সাঁকোয় গাড়ি
চলে ধকো ধকো ডাক ছাড়ি॥

নদী এইমতো অবশেষে
এল নরম মাটির দেশে।
হেথা যেথায় মোদের বাড়ি
নদী আসিল দুয়ারে তারি।
হেথায় নদী নালা বিল খালে
দেশ ঘিরেছে জলের জালে।
কত মেয়েরা নাহিছে ঘাটে,
কত ছেলেরা সাঁতার কাটে,
কত জেলেরা ফেলিছে জাল,
কত মাঝিরা ধরেছে হাল,

সুখে সারিগান গায় দাঁড়ি—
কত খেয়াতরী দেয় পাড়ি ॥

কোথাও পুরাতন শিবালয়
তীরে সারি সারি জেগে রয়।
সেথায় দু বেলা সকাল-সাঁঝে
পূজার কাঁসর ঘণ্টা বাজে।
কত জটাধারী ছাইমাখা
ঘাটে বসে আছে যেন আঁকা।
তীরে কোথাও বসেছে হাট,
নৌকো ভরিয়া রয়েছে ঘাট।
মাঠে কলাই সরিষা ধান,
তাহার কে করিবে পরিমাণ!
কোথাও নিবিড় আখের বনে
শালিক চরিছে আপন-মনে ॥

কোথাও ধূধূ করে বালুচর,
সেথায় গাঙশালিকের ঘর।
সেথায় কাছিম বালির তলে
আপন ডিম পেড়ে আসে চলে।
সেথায় শীতকালে বুনো হাঁস
কত ঝাঁকে ঝাঁকে করে বাস।
সেথায় দলে দলে চখাচখী
করে সারা দিন বকাবকি।

সেথায় কাদাখোঁচা তীরে তীরে
কাদায় খোঁচা দিয়ে দিয়ে ফিরে ॥

কোথাও ধানের খেতের ধারে
ঘন কলাবন বাঁশঝাড়ে
ঘন আম-কাঁঠালের বনে
গ্রাম দেখা যায় এক কোণে।
সেথা আছে ধান গোলা-ভরা,
সেথা খড়গুলা রাশ-করা,
সেথা গোয়ালেতে গোরু বাঁধা
কত কালো পাটকিলে সাদা।
কোথাও কলুদের কুঁড়েখানি,
সেথায় ক্যাঁকোঁ ক'রে ঘোরে ঘানি।
কোথাও কুমারের ঘরে চাক
দেয় সারাদিন ধ'রে পাক।
মুদি দোকানেতে সারা খন
ব'সে পড়িতেছে রামায়ণ।
কোথাও বসি পাঠশালা-ঘরে
যত ছেলেরা চেঁচিয়ে পড়ে,
বড়ো বেতখানি লয়ে কোলে
ঘুমে গুরুমহাশয় ঢোলে।
হোথায় এঁকেবেঁকে ভেঙেচুরে
গ্রামের পথ গেছে বহু দূরে।
সেথায় বোঝাই গোরুর গাড়ি
ধীরে চলিয়াছে ডাক ছাড়ি।

রোগা গ্রামের কুকুরগুলো
ক্ষুধায় শুঁকিয়া বেড়ায় ধুলো ॥

যেদিন পুরনিমা রাতি আসে
চাঁদ আকাশ জুড়িয়া হাসে—
বনে ও পারে আঁধার কালো,
জলে ঝিকিমিকি করে আলো,
বালি চিকিচিকি করে চরে,
ছায়া ঝোপে বসি থাকে ডরে।
সবাই ঘুমায় কুটিরতলে,
তরী একটিও নাহি চলে।
গাছে পাতাটিও নাহি নড়ে,
জলে ঢেউ নাহি ওঠে পড়ে।
কভু ঘুম যদি যায় ছুটে
কোকিল কুহু কুহু গেয়ে উঠে,
কভু ও পারে চরের পাখি
রাতে স্বপনে উঠিছে ডাকি ॥

নদী চলেছে ডাহিনে বামে,
কভু কোথাও সে নাহি থামে।
হেথায় গহন গভীর বন—
তীরে নাহি লোক, নাহি জন।
শুধু কুমির নদীর ধারে
সুখে রোদ পোহাইছে পাড়ে।
বাঘ ফিরিতেছে ঝোপেঝাপে,

ঘাড়ে পড়ে আসি এক লাফে।
কোথাও দেখা যায় চিতাবাঘ
তাহার গায়ে চাকা চাকা দাগ,
রাতে চুপিচুপি আসি ঘাটে
জল চকো চকো করি চাটে ॥
হেথায় যখন জোয়ার ছোটে
নদী ফুলিয়ে ফুলিয়ে ওঠে।
তখন কানায় কানায় জল—
কত ভেসে আসে ফুল ফল,
ঢেউ হেসে উঠে খলখল,
তরী করি উঠে টলমল।
নদী অজগরসম ফুলে
গিলে খেতে চায় দুই কূলে।
আবার ক্রমে আসে ভাঁটা প'ড়ে—
তখন জল যায় সরে সরে,
তখন নদী রোগা হয়ে আসে,
কাদা দেখা দেয় দুই পাশে,
বেরোয় ঘাটের সোপান যত
যেন বুকের হাড়ের মতো ॥

নদী চলে যায় কত দূরে
ততই জল উঠে পূরে পূরে।
শেষে দেখা নাহি যায় কূল,
চোখে দিক হয়ে যায় ভুল।

নীল হয়ে আসে জলধারা,
মুখে লাগে যেন নুন-পারা।
ক্রমে নীচে নাহি পাই তল,
ক্রমে আকাশে মিশায় জল,
ডাঙা কোন্‌খানে পড়ে রয়—
শুধু জলে জলে জলময়॥

ওরে একি শুনি কোলাহল,
হেরি একি ঘননীল জল।
ওই বুঝি রে সাগর হোথা—
উহার কিনারা কে জানে কোথা।
ওই লাখো লাখো ঢেউ উঠে
সদাই মরিতেছে মাথা কুটে।
ওঠে সাদা সাদা ফেনা যত
যেন বিষম রাগের মতো।
জল গরজি গরজি ধায়,
যেন আকাশ কাড়িতে চায়।
বায়ু কোথা হতে আসে ছুটে,
ঢেউয়ে হাহা ক'রে পড়ে লুটে।
যেন পাঠশালা-ছাড়া ছেলে
ছুটে লাফায় বেড়ায় খেলে।
হেথা যত দূর-পানে চাই
কোথাও কিছু নাই কিছু নাই—
শুধু আকাশ বাতাস জল,
শুধুই কলকল কোলাহল,

শুধু ফেনা আর শুধু ঢেউ—
আর নাহি কিছু, নাহি কেউ ॥

হেথায় ফুরাইল সব দেশ,
নদীর ভ্রমণ হইল শেষ।
হেথা সারা দিন সারা বেলা
তাহার ফুরাবে না আর খেলা।
তাহার সারা দিন নাচ গান
কভু হবে নাকো অবসান।
এখন কোথাও হবে না যেতে,
সাগর নিল তারে বুক পেতে।
তারে নীল বিছানায় থুয়ে
তাহার কাদামাটি দিবে ধুয়ে।
তারে ফেনার কাপড়ে ঢেকে,
তারে ঢেউয়ের দোলায় রেখে,
তার কানে কানে গেয়ে সুর
তার শ্রম করি দিবে দূর।
নদী চিরদিন চিরনিশি
রবে অতল আদরে মিশি ॥

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর

দিনের আলো নিবে এল,
সুয্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে
চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে—
রঙের উপর রঙ,
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা
বাজল ঠঙ ঠঙ।
ও পারেতে বিষ্টি এল,
ঝাপসা গাছপালা।
এ পারেতে মেঘের মাথায়
একশো মানিক জ্বালা।
বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে
ছেলেবেলার গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদেয় এল বান॥

আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা,
কোথায় বা সীমানা।
দেশে দেশে খেলে বেড়ায়,
কেউ করে না মানা।
কত নতুন ফুলের বনে
বিষ্টি দিয়ে যায়—

পলে পলে নতুন খেলা
কোথায় ভেবে পায়।
মেঘের খেলা দেখে কত
খেলা পড়ে মনে—
কত দিনের নুকোচুরি
কত ঘরের কোণে।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে
ছেলেবেলার গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদেয় এল বান॥

মনে পড়ে ঘরটি আলো
মায়ের হাসিমুখ,
মনে পড়ে মেঘের ডাকে
গুরু-গুরু বুক।
বিছানাটির একটি পাশে
ঘুমিয়ে আছে খোকা,
মায়ের 'পরে দৌরাত্ম্যি সে
না যায় লেখাজোকা।
ঘরেতে দুরন্ত ছেলে
করে দাপাদাপি,
বাইরেতে মেঘ ডেকে ওঠে—
সৃষ্টি ওঠে কাঁপি।
মনে পড়ে মায়ের মুখে
শুনেছিলেম গান—

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদেয় এল বান ॥

মনে পড়ে সুয়োরানী
দুয়োরানীর কথা,
মনে পড়ে অভিমানী
কঙ্কাবতীর ব্যথা,
মনে পড়ে ঘরের কোণে
মিটিমিটি আলো,
একটা দিকের দেয়ালেতে
ছায়া কালো কালো।
বাইরে কেবল জলের শব্দ
ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্—
দস্যি ছেলে গল্প শোনে
একেবারে চুপ।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে
মেঘলা দিনের গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদেয় এল বান ॥

কবে বিষ্টি পড়েছিল,
বান এল সে কোথা!
শিবঠাকুরের বিয়ে হল
কবেকার সে কথা!

সেদিনও কি এম্‌নিতরো
মেঘের ঘটাখানা?
থেকে থেকে বাজ বিজুলি
দিচ্ছিল কি হানা?
তিন কন্যে বিয়ে ক'রে
কী হল তার শেষে?
না জানি কোন্ নদীর ধারে
না জানি কোন্ দেশে
কোন্ ছেলেরে ঘুম পাড়াতে
কে গাহিল গান—
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদেয় এল বান॥

সাত ভাই চম্পা

সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে
সাতটি চাঁপা ভাই,
রাঙাবসন পারুল-দিদি
তুলনা তার নাই।
সাতটি সোনা-চাঁপার মধ্যে
সাতটি সোনা মুখ,
পারুল-দিদির কচি মুখটি,
করতেছে টুক্‌টুক্‌।
ঘুমটি ভাঙে পাখির ডাকে,
রাতটি যে পোহালো—
ভোরের বেলা চাঁপায় পড়ে
চাঁপার মতো আলো।
শিশির দিয়ে মুখটি মেজে
মুখখানি বের ক'রে
কী দেখছে সাত ভায়েতে
সারা সকাল ধ'রে॥

দেখছে চেয়ে ফুলের বনে
গোলাপ ফোটে ফোটে,
পাতায় পাতায় রোদ পড়েছে—
চিক্‌চিকিয়ে ওঠে।
দোলা দিয়ে বাতাস পালায়
দুষ্টু ছেলের মতো,

লতায় পাতায় হেলাদোলা
কোলাকুলি কত।
গাছটি কাঁপে নদীর ধারে,
ছায়াটি কাঁপে জলে—
ফুলগুলি সব কেঁদে পড়ে
শিউলি গাছের তলে।
ফুলের থেকে মুখ বাড়িয়ে
দেখতেছে ভাই বোন—
দুখিনী এক মায়ের তরে
আকুল হল মন ॥

সারাটা দিন কেঁপে কেঁপে
পাতার ঝুরুঝুরু,
মনের সুখে বনের যেন
বুকের দুরুদুরু।
কেবল শুনি কুলুকুলু,
একি ঢেউয়ের খেলা!
বনের মধ্যে ডাকে ঘুঘু
সারা দুপুর বেলা।
মৌমাছি সে গুনগুনিয়ে
খুঁজে বেড়ায় কাকে,
ঘাসের মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ ক'রে
ঝিঁঝি পোকা ডাকে।
ফুলের পাতায় মাথা রেখে
শুনতেছে ভাই বোন—

মায়ের কথা মনে প'ড়ে
আকুল করে মন ॥

মেঘের পানে চেয়ে দেখে—
মেঘ চলেছে ভেসে,
রাজহাঁসেরা উড়ে উড়ে
চলেছে কোন্ দেশে,
প্রজাপতির বাড়ি কোথায়
জানে না তো কেউ,
সমস্ত দিন কোথায় চলে
লক্ষ হাজার ঢেউ।
দুপুর বেলা থেকে থেকে
উদাস হল বায়—
শুকনো পাতা খ'সে প'ড়ে
কোথায় উড়ে যায়।
ফুলের মাঝে দুই গালে হাত
দেখতেছে ভাই বোন—
মায়ের কথা পড়ছে মনে,
কাঁদছে পরান মন ॥

সন্ধে হলে জোনাই জ্বলে
পাতায় পাতায়,
অশথ গাছে দুটি তারা

গাছের মাথায়।
বাতাস বওয়া বন্ধ হল,
স্তব্ধ পাখির ডাক,
থেকে থেকে করছে কা-কা
দুটো-একটা কাক।
পশ্চিমেতে ঝিকিমিকি,
পুবে আঁধার করে—
সাতটি ভাইয়ে গুটিসুটি
চাঁপা ফুলের ঘরে।
'গল্প বলো পারুল-দিদি'
সাতটি চাঁপা ডাকে—
পারুল-দিদির গল্প শুনে
মনে পড়ে মাকে॥

প্রহর বাজে, রাত হয়েছে
ঝাঁ ঝাঁ করে বন—
ফুলের মাঝে ঘুমিয়ে প'ল
আটটি ভাই বোন।
সাতটি তারা চেয়ে আছে
সাতটি চাঁপার বাগে,
চাঁদের আলো সাতটি ভায়ের
মুখের 'পরে লাগে।
ফুলের গন্ধ ঘিরে আছে
সাতটি ভায়ের তনু—

কোমল শয্যা কে পেতেছে
সাতটি ফুলের রেণু।
ফুলের মধ্যে সাত ভায়েতে
স্বপন দেখে মাকে—
সকাল বেলা 'জাগো জাগো'
পারুল-দিদি ডাকে ॥

বিম্ববতী

রূপকথা

সযত্নে সাজিল রানী, বাঁধিল কবরী,
নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ নব নীলাম্বরী
পরিল অনেক সাধে। তার পরে ধীরে
গুপ্ত আবরণ খুলি আনিল বাহিরে
মায়াময় কনকদর্পণ। মন্ত্র পড়ি
শুধালই তারে, 'কহো মোরে সত্য করি,
সর্বশ্রেষ্ঠ রূপসী কে ধরায় বিরাজে।'
ফুটিয়া উঠিল ধীরে মুকুরের মাঝে
মধুমাখা হাসি-আঁকা একখানি মুখ;
দেখিয়া বিদারি গেল মহিষীর বুক—
রাজকন্যা বিম্ববতী, সতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে ॥

তার পরদিন রানী প্রবালের হার
পরিল গলায়। খুলি দিল কেশভার
আজানুচুম্বিত। গোলাপী অঞ্চলখানি,
লজ্জার আভাস-সম, বক্ষে দিল টানি।
সুবর্ণমুকুর রাখি কোলের উপরে
শুধাইল মন্ত্র পড়ি, 'কহো সত্য ক'রে
ধরা-মাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী।'
দর্পণে উঠিল ফুটি সেই মুখশশী।
কাঁপিয়া কহিল রানী, অগ্নিসম জ্বালা,

'পরালেম তারে আমি বিষফুলমালা,
তবু মরিল না জ্বলে সতিনের মেয়ে—
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!'

তার পরদিনে— আবার রুধিল দ্বার
শয়নমন্দিরে। পরিল মুক্তার হার,
ভালে সিন্দূরের টিপ, নয়নে কাজল,
রক্তাম্বর পট্টবাস, সোনার আঁচল।
শুধাইল দর্পণেরে, 'কহো সত্য করি,
ধরাতলে সব চেয়ে কে আজি সুন্দরী।'
উজ্জ্বল কনকপটে ফুটিয়া উঠিল
সেই হাসিমাখা মুখ। হিংসায় লুটিল
রানী শয্যার উপরে। কহিল কাঁদিয়া,
'বনে পাঠালেম তারে কঠিন বাঁধিয়া,
এখনো সে মরিল না সতিনের মেয়ে—
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে!'

তার পরদিনে— আবার সাজিল সুখে
নব অলংকারে, বিরচিল হাসিমুখে
কবরী নূতন ছাঁদে বাঁকাইয়া গ্রীবা।
পরিল যতন করি নবরৌদ্রবিভা
নব পীতবাস। দর্পণ সম্মুখে ধ'রে
শুধাইল মন্ত্র পড়ি, 'সত্য কহো মোরে,
ধরা-মাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী।'

সেই হাসি, সেই মুখ উঠিল বিকশি
মোহন মুকুরে। রানী কহিল জ্বলিয়া,
'বিষফল খাওয়ালেম তাহারে ছলিয়া,
তবুও সে মরিল না সতিনের মেয়ে—
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!'

তার পরদিনে রানী কনক-রতনে
খচিত করিল তনু অনেক যতনে।
দর্পণেরে শুধাইল বহু দর্পভরে,
'সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ কার বলো সত্য ক'রে।'
দুইটি সুন্দর মুখ দেখা দিল হাসি,
রাজপুত্র রাজকন্যা দোঁহে পাশাপাশি
বিবাহের বেশে। অঙ্গে অঙ্গে শিরা যত
রানীরে দংশিল যেন বৃশ্চিকের মতো।
চীৎকারি কহিল রানী কর হানি বুকে,
'মরিতে দেখেছি তারে আপন সম্মুখে,
কার প্রেমে বাঁচিল সে সতিনের মেয়ে—
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!'

ঘষিতে লাগিল রানী কনকমুকুর
বালু দিয়ে, প্রতিবিম্ব নাহি হল দূর।
মসি লেপি দিল তবু ছবি ঢাকিল না,
অগ্নি দিল তবুও তো গলিল না সোনা।
আছাড়ি ফেলিল ভূমে প্রাণপণ বলে—
ভাঙিল না সে মায়া-দর্পণ। ভূমিতলে

চকিতে পড়িল রানী, টুটি গেল প্রাণ—
সর্বাঙ্গে হীরক-মণি অগ্নির সমান
লাগিল জ্বলিতে; ভূমে পড়ি তারি পাশে
কনকদর্পণে দুটি হাসিমুখ হাসে।
বিম্ববতী, মহিষীর সতিনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে ॥

নবীন অতিথি

গান

ওহে নবীন অতিথি,
তুমি নূতন কি তুমি চিরন্তন।
যুগে যুগে কোথা তুমি ছিলে সংগোপন।
যতনে কত কী আনি
বেঁধেছিনু গৃহখানি,
হেথা কে তোমারে বলো করেছিল নিমন্ত্রণ।
কত আশা ভালোবাসা গভীর হৃদয়তলে
ঢেকে রেখেছিনু বুকে কত হাসি অশ্রুজলে।
একটি না কহি বাণী
তুমি এলে মহারানী—
কেমনে গোপনে মনে করিলে হে পদার্পণ॥

অস্তসখী

রজনী একাদশী   পোহায় ধীরে ধীরে,
রঙিন মেঘমালা   উষারে বাঁধে ঘিরে।
আকাশে ক্ষীণ শশী   আড়ালে যেতে চায়,
দাঁড়ায়ে মাঝখানে   কিনারা নাহি পায় ॥

এ-হেন কালে যেন   মায়ের পানে মেয়ে
রয়েছে শুকতারা   চাঁদের মুখে চেয়ে।
কে তুমি মরি মরি,   একটুখানি প্রাণ—
এনেছ কী না জানি   করিতে ওরে দান ॥

মহিমা যত ছিল   উদয়-বেলাকার
যতেক সুখসাথী   এখনি যাবে যার,
পুরানো সব গেল—   নূতন তুমি একা
বিদায়কালে তারে   হাসিয়া দিলে দেখা ॥

ও চাঁদ যামিনীর   হাসির অবশেষ,
ও শুধু অতীতের   সুখের স্মৃতিলেশ,
তারারা দ্রুতপদে   কোথায় গেছে সরে—
পারে নি সাথে যেতে,   পিছিয়ে আছে পড়ে ॥

তাদেরি পানে ও যে   নয়ন ছিল মেলি,
তাদেরি পথে ও যে   চরণ ছিল ফেলি,

এমন সময়ে কে   ডাকিলে পিছু-পানে
একটি আলোকেরি   একটু মৃদু গানে ॥

গভীর রজনীর   রিক্ত ভিখারিকে
ভোরের বেলাকার   কী লিপি দিলে লিখে।
সোনার-আভা-মাখা   কী নব আশাখানি
শিশিরজলে ধুয়ে   তাহারে দিলে আনি ॥

অস্ত-উদয়ের   মাঝেতে তুমি এসে
প্রাচীন নবীনেরে   টানিছ ভালোবেসে—
বধূ ও বর -রূপে   করিলে এক-হিয়া
করুণ কিরণের   গ্রন্থি বাঁধি দিয়া ॥

[আলমোড়া
১ ভাদ্র ? ১৩১০]

হাসিরাশি

নাম রেখেছি বাব্‌লারানী,
একরত্তি মেয়ে।
হাসিখুশি চাঁদের আলো
মুখটি আছে ছেয়ে!
ফুট্‌ফুটে তার দাঁত কখানি,
পুট্‌পুটে তার ঠোঁট।
মুখের মধ্যে কথাগুলি সব
উলোট-পালোট।
কচি কচি হাত দুখানি,
কচি কচি মুঠি।
মুখ নেড়ে কেউ কথা কইলে
হেসেই কুটি কুটি।
তাই তাই তাই তালি দিয়ে
দুলে দুলে নড়ে,
চুলগুলি সব কালো কালো
মুখে এসে পড়ে।
'চলি চলি পা পা'
টলি টলি যায়,
গরবিনী হেসে হেসে
আড়ে আড়ে চায়।
হাতটি তুলে চুড়ি দুগাছি
দেখায় যাকে তাকে,
হাসির সঙ্গে নেচে নেচে

নোলক দোলে নাকে।
রাঙা দুটি ঠোঁটের কাছে
মুক্তো আছে ফ'লে,
মায়ের চুমোখানি যেন
মুক্তো হয়ে দোলে।
আকাশেতে চাঁদ দেখেছে
দু-হাত তুলে চায়,
মায়ের কোলে দুলে দুলে
ডাকে 'আয় আয়'।
চাঁদের আঁখি জুড়িয়ে গেল
তার মুখেতে চেয়ে,
চাঁদ ভাবে কোথ্‌থেকে এল
চাঁদের মতো মেয়ে।
কচি প্রাণের হাসিখানি
চাঁদের পানে ছোটে,
চাঁদের মুখের হাসি আরো
বেশি ফুটে ওঠে।
এমন সাধের ডাক শুনে চাঁদ
কেমন করে আছে—
তারাগুলি ফেলে বুঝি
নেমে আসবে কাছে।
সুধামুখের হাসিখানি
চুরি করে নিয়ে
রাতারাতি পালিয়ে যাবে
মেঘের আড়াল দিয়ে।

আমরা তারে রাখব ধরে
রানীর পাশেতে,
হাসিরাশি বাঁধা রবে
হাসিরাশিতে॥

পরিচয়

একটি মেয়ে আছে জানি,
পল্লীটি তার দখলে।
সবাই তারি পুজো জোগায়,
লক্ষ্মী বলে সকলে।
আমি কিন্তু বলি তোমায়,
কথায় যদি মন দেহ,
খুব যে উনি লক্ষ্মী মেয়ে—
আছে আমার সন্দেহ।
ভোরের বেলা আঁধার থাকে,
ঘুম যে কোথা ছোটে ওর,
বিছানাতে হুলুস্থুলু
কলরবের চোটে ওর।
খিল্‌খিলিয়ে হাসে শুধু
পাড়াসুদ্ধ জাগিয়ে,
আড়ি করে পালাতে যায়
মায়ের কোলে না গিয়ে॥

হাত বাড়িয়ে মুখে সে চায়,
আমি তখন নাচারই—
কাঁধের 'পরে তুলে তারে
করে বেড়াই পাচারি।
মনের মতো বাহন পেয়ে
ভারি মনের খুশিতে

মারে আমায় মোটা মোটা
নরম নরম ঘুষিতে।
আমি ব্যস্ত হয়ে বলি,
‘একটু রোসো রোসো মা!’
মুঠো করে ধরতে আসে
আমার চোখের চশমা।
আমার সঙ্গে কলভাষায়
করে কতই কলহ।
তুমুল কাণ্ড! তোমরা তারে
শিষ্ট আচার বলহ?

তবু তো তার সঙ্গে আমার
বিবাদ করা সাজে না।
সে নইলে যে তেমন ক'রে
ঘরের বাঁশি বাজে না।
সে না হলে সকালবেলায়
এত কুসুম ফুটবে কি।
সে না হলে সন্ধেবেলায়
সন্ধেতারা উঠবে কি।
একটি দণ্ড ঘরে আমার
না যদি রয় দুরন্ত
কোনোমতে হয় না তবে
বুকের শূন্য পূরণ তো।
দুষ্টুমি তার দখিন হাওয়া
সুখের তুফান-জাগানে,

দোলা দিয়ে যায় গো আমার
হৃদয়ের ফুল-বাগানে॥

নাম যদি তার জিগেস কর
সেই আছে এক ভাবনা,
কোন নামে যে দিই পরিচয়
সে তো ভেবেই পাব না!
নামের খবর কে রাখে ওর,
ডাকি ওরে যা খুশি—
দুষ্টু বল, দস্যি বল,
পোড়ারমুখী, রাক্ষুসী।
বাপ-মায়ে যে নাম দিয়েছে
বাপ-মায়েরই থাক্ সে নয়,
ছিষ্টি খুঁজে মিষ্টি নামটি
তুলে রাখুন বাক্সে নয়।
একজনেতে নাম রাখবে
কখন অন্নপ্রাশনে,
বিশ্বসুদ্ধ সে নাম নেবে—
ভারি বিষম শাসন এ।
নিজের মনের মতো সবাই
করুন কেন নামকরণ—
বাবা ডাকুন চন্দ্রকুমার,
খুড়ো ডাকুন রামচরণ।
ঘরের মেয়ে তার কি সাজে
সংস্কৃত নামটা ওই—

এতে কারো দাম বাড়ে না
অভিধানের দামটা বৈ।
আমি বাপু ডেকেই বসি
যেটাই মুখে আসুক-না—
যারে ডাকি সেই তো বোঝে,
আর সকলে হাসুক-না।
একটি ছোটো মানুষ তাঁহার
একশো রকম রঙ্গ তো—
এমন লোককে একটি নামেই
ডাকা কি হয় সংগত ॥

বিচ্ছেদ

বাগানে ওই দুটো গাছে
ফুল ফুটেছে কত যে,
ফুলের গন্ধে মনে পড়ে
ছিল ফুলের মতো যে।
ফুল যে দিত ফুলের সঙ্গে
আপন সুধা মাখায়ে,
সকাল হত সকাল বেলায়
যাহার পানে তাকায়ে,
সেই আমাদের ঘরের মেয়ে
সে গেছে আজ প্রবাসে,
নিয়ে গেছে এখান থেকে
সকাল বেলার শোভা সে।
একটুখানি মেয়ে আমার
কত যুগের পুণ্য যে,
একটুখানি সরে গেছে
কতখানিই শূন্য যে ॥

বিষ্টি পড়ে টুপুর টুপুর,
মেঘ করেছে আকাশে,
উষার রাঙা মুখখানি আজ
কেমন যেন ফ্যাকাশে!
বাড়িতে যে কেউ কোথা নেই,
দুয়োরগুলো ভেজানো—

ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়াই
ঘরে আছে কে যেন।
ময়নাটি ওই চুপটি করে
ঝিমোচ্ছে সেই খাঁচাতে,
ভুলে গেছে নেচে নেচে
পুচ্ছটি তার নাচাতে।
ঘরের কোণে আপন-মনে
শূন্য প'ড়ে বিছানা,
কার তরে সে কেঁদে মরে—
সে কল্পনা মিছা না।
বইগুলো সব ছড়িয়ে আছে,
নাম লেখা তায় কার গো—
এম্‌নি তারা রবে কি হায়,
খুলবে না কেউ আর গো?
এটা আছে সেটা আছে,
অভাব কিছু নেই তো—
স্মরণ ক'রে দেয় রে যারে
থাকে নাকো সেই তো॥

উপহার

স্নেহ-উপহার এনে দিতে চাই,
কী যে দেব তাই ভাবনা—
যত দিতে সাধ করি মনে মনে
খুঁজে-পেতে সে তো পাব না।
আমার যা ছিল ফাঁকি দিয়ে নিতে
সবাই করেছে একতা,
বাকি যে এখন আছে কত ধন
না তোলাই ভালো সে কথা।
সোনা-রুপো আর হীরে-জহরত
পোঁতা ছিল সবই মাটিতে,
জহরি যে যত সন্ধান পেয়ে
নে গেছে যে যার বাটীতে।
টাকাকড়ি মেলা আছে টাকশালে,
নিতে গেলে পড়ি বিপদে।
বসনভূষণ আছে সিন্দুকে,
পাহারাও আছে ফি পদে॥

এ যে সংসারে আছি মোরা সবে
এ বড়ো বিষম দেশ রে।
ফাঁকিফুঁকি দিয়ে দূরে চ'লে গিয়ে
ভুলে গিয়ে সব শেষ রে।
ভয়ে ভয়ে তাই স্মরণচিহ্ন
যে যাহারে পারে দেয় যে।

তাও কত থাকে, কত ভেঙে যায়,
কত মিছে হয় ব্যয় যে।
স্নেহ যদি কাছে রেখে যাওয়া যেত,
চোখে যদি দেখা যেত রে,
কতগুলো তবে জিনিসপত্র
বল্ দেখি দিত কে তোরে।
তাই ভাবি মনে কী ধন আমার
দিয়ে যাব তোরে নুকিয়ে—
খুশি হবি তুই, খুশি হব আমি,
বাস্, সব যাবে চুকিয়ে॥

কিছু দিয়ে-থুয়ে চিরদিন-তরে
কিনে রেখে দেব মন তোর—
এমন আমার মন্ত্রণা নেই,
জানি নে'ও হেন মন্তর।
নবীন জীবন, বহুদূর পথ
পড়ে আছে তোর সুমুখে—
স্নেহরস মোরা যেটুকু যা দিই
পিয়ে নিস এক চুমুকে।
সাথীদলে জুটে চলে যাস ছুটে
নব আশে নব পিয়াসে—
যদি ভুলে যাস, সময় না পাস,
কী যায় তাহাতে কী আসে।
মনে রাখিবার চির-অবকাশ
থাকে আমাদেরি বয়সে,

বাহিরেতে যার না পাই নাগাল
অন্তরে জেগে রয় সে ॥

পাষাণের বাধা ঠেলেঠুলে নদী
আপনার মনে সিধে সে
কলগান গেয়ে দুই তীর বেয়ে
যায় চলে দেশ-বিদেশে—
যার কোল হতে ঝরনার স্রোতে
এসেছে আদরে গলিয়া
তারে ছেড়ে দূরে যায় দিনে দিনে
অজানা সাগরে চলিয়া।
অচল শিখর ছোটো নদীটিরে
চিরদিন রাখে স্মরণে—
যত দূরে যায় স্নেহধারা তার
সাথে যায় দ্রুত চরণে।
তেমনি তুমিও থাক না'ই থাক,
মনে কর মনে কর না,
পিছে পিছে তব চলিবে ঝরিয়া
আমার আশিস-ঝরনা ॥

পাখির পালক

খেলাধুলো সব রহিল পড়িয়া,
ছুটে চ'লে আসে মেয়ে—
বলে তাড়াতাড়ি, 'ও মা, দেখ্ দেখ্,
কী এনেছি দেখ্ চেয়ে।'
আঁখির পাতায় হাসি চমকায়,
ঠোঁটে নেচে ওঠে হাসি—
হয়ে যায় ভুল, বাঁধে নাকো চুল,
খুলে পড়ে কেশরাশি।
দুটি হাত তার ঘিরিয়া ঘিরিয়া
রাঙা চুড়ি কয়গাছি,
করতালি পেয়ে বেজে ওঠে তারা,
কেঁপে ওঠে তারা নাচি।
মায়ের গলায় বাহু দুটি বেঁধে
কোলে এসে বসে মেয়ে—
বলে তাড়াতাড়ি, 'ও মা, দেখ্ দেখ্,
কী এনেছি দেখ্ চেয়ে।'

সোনালি রঙের পাখির পালক
ধোওয়া সে সোনার স্রোতে—
খসে এল যেন তরুণ আলোক
অরুণের পাখা হতে।
নয়ন-ঢুলানো কোমল পরশ
ঘুমের পরশ যথা—
মাখা যেন তায় মেঘের কাহিনী,
নীল আকাশের কথা।

ছোটোখাটো নীড়, শাবকের ভিড়,
কতমত কলরব,
প্রভাতের সুখ, উড়িবার আশা—
মনে পড়ে যেন সব।
লয়ে সে পালক কপোলে বুলায়,
আঁখিতে বুলায় মেয়ে—
বলে হেসে হেসে, 'ও মা, দেখ্ দেখ্,
কী এনেছি দেখ্ চেয়ে।'

মা দেখিল চেয়ে, কহিল হাসিয়ে,
'কিবা জিনিসের ছিরি!'
ভূমিতে ফেলিয়া গেল সে চলিয়া,
আর না চাহিল ফিরি।
মেয়েটির মুখে কথা না ফুটিল,
মাটিতে রহিল বসি—
শূন্য হতে যেন পাখির পালক
ভূতলে পড়িল খসি।
খেলাধুলো তার হল নাকো আর,
হাসি মিলাইল মুখে—
ধীরে ধীরে শেষে দুটি ফোঁটা জল
দেখা দিল দুটি চোখে।
পালকটি লয়ে রাখিল লুকায়ে
গোপনের ধন তার—
আপনি খেলিত, আপনি তুলিত,
দেখাত না কারে আর॥

অভিমানিনী

এলোথেলো চুলগুলি ছড়িয়ে
ওই দেখো সে দাঁড়িয়ে রয়েছে,
নিমেষহারা আঁখির পাতা দুটি
চোখের জলে ভরে এয়েছে।
গ্রীবাখানি ঈষৎ বাঁকানো,
দুটি হাতে মুঠি আছে চাপি,
ছোটো ছোটো রাঙা রাঙা ঠোঁট
ফুলে ফুলে উঠিতেছে কাঁপি।
সাধিলে ও কথা কবে না,
ডাকিলে ও আসিবে না কাছে—
সবার ’পরে অভিমান ক’রে
আপনা নিয়ে দাঁড়িয়ে শুধু আছে।
‘কী হয়েছে’ ‘কী হয়েছে’ ব’লে
বাতাস এসে চুলগুলি দোলায়,
রাঙা ওই কপোলখানিতে
রবির হাসি হেসে চুমো খায়।
কচি হাতে ফুল দুখানি ছিল,
রাগ ক’রে ওই ফেলে দিয়েছে—
পায়ের কাছে প’ড়ে প’ড়ে তারা
মুখের পানে চেয়ে রয়েছে॥

পূজার সাজ

আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি,
পূজার সময় এল কাছে।
মধু বিধু দুই ভাই ছুটাছুটি করে তাই
আনন্দে দু-হাত তুলি নাচে।

পিতা বসি ছিল দ্বারে দুজনে শুধালো তারে,
'কী পোশাক আনিয়াছ কিনে।'
পিতা কহে, 'আছে আছে তোদের মায়ের কাছে,
দেখিতে পাইবি ঠিক দিনে।'

সবুর সহে না আর— জননীরে বার বার
কহে, 'মা গো, ধরি তোর পায়ে,
বাবা আমাদের তরে কী কিনে এনেছে ঘরে
একবার দে-না মা, দেখায়ে।'
ব্যস্ত দেখি হাসিয়া মা দুখানি ছিটের জামা
দেখাইল করিয়া আদর।
মধু কহে, 'আর নেই?' মা কহিল, 'আছে এই
একজোড়া ধুতি ও চাদর।'
রাগিয়া আগুন ছেলে— কাপড় ধুলায় ফেলে
কাঁদিয়া কহিল, 'চাহি না মা!
রায়বাবুদের গুপি পেয়েছে জরির টুপি,
ফুলকাটা সাটিনের জামা।'
মা কহিল, 'মধু, ছি ছি, কেন কাঁদ মিছামিছি!
গরিব যে তোমাদের বাপ।

এবার হয় নি ধান, কত গেছে লোকসান,
পেয়েছেন কত দুঃখ তাপ।
তবু দেখো বহু ক্লেশে তোমাদের ভালোবেসে
সাধ্যমত এনেছেন কিনে—
সে জিনিস অনাদরে ফেলিলি ধূলির 'পরে,
এই শিক্ষা হল এত দিনে!'

বিধু বলে, 'এ কাপড় পছন্দ হয়েছে মোর,
এই জামা পরাস আমারে।'
মধু শুনে আরো রেগে ঘর ছেড়ে দ্রুত বেগে
গেল রায়বাবুদের দ্বারে।
সেথা মেলা লোক জড়ো; রায়বাবু ব্যস্ত বড়ো
দালান সাজাতে গেছে রাত।
মধু যবে এক কোণে দাঁড়াইল ম্লানমনে
চোখে তাঁর পড়িল হঠাৎ।
কাছে ডাকি স্নেহভরে কহেন করুণ স্বরে
তারে দুই বাহুতে বাঁধিয়া,
'কী রে মধু, হয়েছে কী, তোরে যে শুকনো দেখি।'
শুনি মধু উঠিল কাঁদিয়া—
কহিল, 'আমার তরে বাবা আনিয়াছে ঘরে
শুধু এক ছিটের কাপড়!'
শুনি রায়-মহাশয় হাসিয়া মধুরে কয়,
'সেজন্য ভাবনা কিবা তোর!'
ছেলেরে ডাকিয়া চুপি কহিলেন, 'ওরে গুপি,
তোর জামা দে তুই মধুকে।'

গুপির সে জামা পেয়ে মধু ঘরে যায় ধেয়ে,
হাসি আর নাহি ধরে মুখে।

বুক ফুলাইয়া চলে, সবারে ডাকিয়া বলে,
'দেখো কাকা, দেখো চেয়ে মামা—
ওই আমাদের বিধু ছিট পরিয়াছে শুধু,
মোর গায়ে সাটিনের জামা।'

মা শুনি কহেন আসি লাজে অশ্রুজলে ভাসি
কপালে করিয়া করাঘাত—
'হই দুঃখী হই দীন কাহারো রাখি না ঋণ,
কারো কাছে পাতি নাই হাত।
তুমি আমাদেরি ছেলে ভিক্ষা লয়ে অবহেলে
অহংকার কর ধেয়ে ধেয়ে!
ছেঁড়া ধুতি আপনার ঢের বেশি দাম তার
ভিক্ষা-করা সাটিনের চেয়ে।
আয় বিধু, আয় বুকে, চুমো খাই চাঁদমুখে—
তোর সাজ সব চেয়ে ভালো।
দরিদ্র ছেলের দেহে দরিদ্র বাপের স্নেহে
ছিটের জামাটি করে আলো।'

সুখদুঃখ

বসেছে আজ রথের তলায় স্নানযাত্রার মেলা।
সকাল থেকে বাদল হল, ফুরিয়ে এল বেলা।
আজকে দিনের মেলামেশা,
যত খুশি, যতই নেশা,
সবার চেয়ে আনন্দময় ওই মেয়েটির হাসি—
এক পয়সায় কিনেছে ও তালপাতার এক বাঁশি।
বাজে বাঁশি, পাতার বাঁশি আনন্দস্বরে
হাজার লোকের হর্ষধ্বনি সবার উপরে॥

ঠাকুরবাড়ি ঠেলাঠেলি লোকের নাহি শেষ,
অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় ভেসে যায় রে দেশ।
আজকে দিনের দুঃখ যত
নাই রে দুঃখ উহার মতো
ওই যে ছেলে কাতর চোখে দোকান-পানে চাহি—
একটি রাঙা লাঠি কিনবে একটি পয়সা নাহি।
চেয়ে আছে নিমেষহারা নয়ন অরুণ,
হাজার লোকের মেলাটিরে করেছে করুণ॥

মালক্ষ্মী

কার পানে মা, চেয়ে আছ
মেলে দুটি করুণ আঁখি।
কে ছিঁড়েছে ফুলের পাতা,
কে ধরেছে বনের পাখি।
কে কারে কী বলেছে গো,
কার প্রাণে বেজেছে ব্যথা—
করুণায় যে ভরে এল
দুখানি তোর আঁখির পাতা।
খেলতে খেলতে মায়ের আমার
আর বুঝি হল না খেলা।
ফুলের গুচ্ছ কোলে প'ড়ে—
কেন, মা এ হেলাফেলা॥

অনেক দুঃখ আছে হেথায়,
এ জগৎ যে দুঃখে ভরা—
তোমার দুটি আঁখির সুধায়
জুড়িয়ে গেল নিখিল ধরা।
লক্ষ্মী আমার বল্ দেখি মা
লুকিয়ে ছিলি কোন্ সাগরে।
সহসা আজ কাহার পুণ্যে
উদয় হলি মোদের ঘরে।
সঙ্গে করে নিয়ে এলি
হৃদয়-ভরা স্নেহের সুধা,

হৃদয় ঢেলে মিটিয়ে যাবি
এ জগতের প্রেমের ক্ষুধা ॥

থামো থামো, ওর কাছেতে
কোয়ো না কেউ কঠোর কথা—
করুণ আঁখির বালাই নিয়ে
কেউ কারে দিয়ো না ব্যথা।
সইতে যদি না পারে ও,
কেঁদে যদি চলে যায়—
এ ধরণীর পাষাণ-প্রাণে
ফুলের মতো ঝরে যায়!
ও যে আমার শিশির-কণা,
ও যে আমার সাঁঝের তারা—
কবে এল কবে যাবে
এই ভয়েতে হই রে সারা ॥

স্নেহময়ী

হাসিতে ভরিয়ে গেছে হাসিমুখখানি।
প্রভাতে ফুলের বনে দাঁড়ায়ে আপন মনে,
মরি মরি, মুখে নাই বাণী।
প্রভাতকিরণগুলি চৌদিকে যেতেছে খুলি
যেন শুভ্র কমলের দল,
আপন মহিমা লয়ে তারি মাঝে দাঁড়াইয়ে
কে তুই করুণাময়ী বল্‌।
অমিয়মাধুরী মাখি চেয়ে আছে দুটি আঁখি,
জগতের প্রাণ জুড়াইছে—
ফুলেরা আমোদে মেতে হেলে দুলে বাতাসেতে
আঁখি হতে স্নেহ কুড়াইছে।
কী যেন জান গো ভাষা, কী যেন দিতেছ আশা,
আঁখি দিয়ে পরান উথলে—
চারি দিকে ফুলগুলি কচি কচি বাহু তুলি
'কোলে নাও' 'কোলে নাও' বলে।
কারে যেন কাছে ডাক', যেথা তুমি বসে থাক'
তার চারি দিকে থাক তুমি—
তোমার আপনা দিয়ে হাসিময়ী শান্তি দিয়ে
পূর্ণ কর চরাচরভূমি।
ওই-যে তোমার কাছে সকলে দাঁড়ায়ে আছে
ওরা মোর আপনার লোক,
ওরাও আমারি মতো তোর স্নেহে আছে রত
জুঁই বেলা বকুল অশোক।

বড়ো সাধ যায় তোরে ফুল হয়ে থাকি ঘিরে
কাননে ফুলের সাথে মিশে—
নয়নকিরণে তোর দুলিবে পরান মোর,
সুবাস ছুটিবে দিশে দিশে।
পরশি তোমার কায় মধুর প্রভাতবায়,
মধুময় কুসুমের বাস—
ওই দৃষ্টিসুধা দাও, এই দিক পানে চাও,
প্রাণে হোক প্রভাতবিকাশ ॥

ঘুম

ঘুমিয়ে পড়েছে শিশুগুলি
খেলাধুলা সব গেছে ভুলি।
ধীরে নিশীথের বায় আসে খোলা জানালায়
ঘুম এনে দেয় আঁখিপাতে।
শয্যায় পায়ের কাছে খেলেনা ছড়ানো আছে
ঘুমিয়েছে খেলাতে খেলাতে।
এলিয়ে গিয়েছে দেহ, মুখে দেবতার স্নেহ
পড়েছে রে ছায়ার মতন।
কালো কালো চুল তার বাতাসেতে বার বার
উড়ে উড়ে ঢাকিছে বদন ॥

সারা রাত স্নেহসুখে তারাগুলি চায় মুখে,
যেন তারা করি গলাগলি
কত কী যে করে বলাবলি।
যেন তারা আঁচলেতে আঁধারে আলোতে গেঁথে
হাসিমাখা সুখের স্বপন
ধীরে ধীরে স্নেহভরে শিশুর প্রাণের 'পরে
একে একে করে বরিষন।
কাল যবে রবিকরে কাননেতে থরে থরে
ফুটে ফুটে উঠিবে কুসুম,
ওদেরও নয়নগুলি ফুটিয়া উঠিবে খুলি
কোথায় মিলায়ে যাবে ঘুম।

প্রভাতের আলো জাগি যেন খেলাবার লাগি
ওদের জাগায়ে দিতে চায়—
আলোতে ছেলেতে ফুলে এক সাথে আঁখি খুলে
প্রভাতে পাখিতে গান গায় ॥

সাধ

অরুণময়ী তরুণী উষা
জাগায়ে দিল গান।
পুরব-মেঘে কনকমুখী
বারেক শুধু মারিল উঁকি,
অমনি যেন জগৎ ছেয়ে
বিকশি উঠে প্রাণ॥

আলোকে আজি করি রে স্নান,
ঘুমাই ফুলবাসে,
পাখির গান লাগে রে যেন
দেহের চারি পাশে।
হৃদয় মোর আকাশ-মাঝে
তারার মতো উঠিতে চায়,
আপন সুখে ফুলের মতো
আকাশ-পানে ফুটিতে চায়।
নিবিড় রাতে আকাশে উঠে
চারি দিকে সে চাহিতে চায়,
তারার মাঝে হারায়ে গিয়ে
আপন-মনে গাহিতে চায়॥

মেঘের মতো হারায়ে দিশা
আকাশ-মাঝে ভাসিতে চায়—

কোথায় যাবে কিনারা নাই,
দিবস নিশি চলেছে তাই,
বাতাস এসে লাগিছে গায়ে,
জোছনা এসে পড়িছে পায়ে,
উড়িয়া কাছে গাহিছে পাখি,
মুদিয়া যেন এসেছে আঁখি,
আকাশ-মাঝে মাথাটি থুয়ে
আরামে যেন ভাসিয়া যায় ॥

হৃদয় মোর মেঘের মতো
আকাশ-মাঝে ভাসিতে চায়।
ধরার পানে মেলিয়া আঁখি
উষার মতো হাসিতে চায়—
মেঘেতে হাসি জড়ায়ে যায়,
বাতাসে হাসি গড়ায়ে যায়,
উষার হাসি ফুলের হাসি
কানন-মাঝে ছড়ায়ে যায়।
হৃদয় মোর আকাশে উঠে
উষার মতো ফুটিতে চায় ॥

কাগজের নৌকা

ছুটি হলে রোজ ভাসাই জলে
কাগজ-নৌকাখানি।
লিখে রাখি তাতে আপনার নাম,
লিখি আমাদের বাড়ি কোন্ গ্রাম
বড়ো বড়ো ক'রে মোটা অক্ষরে
যতনে লাইন টানি।
যদি সে নৌকা আর-কোনো দেশে
আর-কারো হাতে পড়ে গিয়ে শেষে
আমার লিখন পড়িয়া তখন
বুঝিবে সে অনুমানি
কার কাছ হতে ভেসে এল স্রোতে
কাগজ-নৌকাখানি॥

আমার নৌকা সাজাই যতনে
শিউলি বকুলে ভরি।
বাড়ির বাগানে গাছের তলায়
ছেয়ে থাকে ফুল সকাল বেলায়,
শিশিরের জল করে ঝলমল্
প্রভাতের আলো পড়ি।
সেই কুসুমের অতি ছোটো বোঝা
কোন্ দিক-পানে চলে যায় সোজা,
বেলাশেষে যদি পার হয়ে নদী
ঠেকে কোনোখানে যেয়ে—

প্রভাতের ফুল সাঁঝে পাবে কূল
কাগজের তরী বেয়ে॥

আমার নৌকা ভাসাইয়া জলে
চেয়ে থাকি বসি তীরে।
ছোটো ছোটো ঢেউ উঠে আর পড়ে,
রবির কিরণে ঝিকিমিকি করে,
আকাশেতে পাখি চলে যায় ডাকি,
বায়ু বহে ধীরে ধীরে।
গগনের তলে মেঘ ভাসে কত
আমারি সে ছোটো নৌকার মতো—
কে ভাসালে তায়, কোথা ভেসে যায়,
কোন্ দেশে গিয়ে লাগে।
ওই মেঘ আর তরণী আমার
কে যাবে কাহার আগে॥

বেলা হলে শেষে বাড়ি থেকে এসে
নিয়ে যায় মোরে টানি।
আমি ঘরে ফিরি, থাকি কোণে মিশি,
যেথা কাটে দিন সেথা কাটে নিশি,
কোথা কোন্ গাঁয় ভেসে চলে যায়
আমার নৌকাখানি।
কোন্ পথে যাবে কিছু নাই জানা,
কেহ তারে কভু নাহি করে মানা,

ধ'রে নাহি রাখে, ফিরে নাহি ডাকে—
ধায় নব নব দেশে।
কাগজের তরী, তারি 'পরে চড়ি
মন যায় ভেসে ভেসে॥

রাত হয়ে আসে, শুই বিছানায়,
মুখ ঢাকি দুই হাতে—
চোখ বুজে ভাবি এমন আঁধার,
কালি দিয়ে ঢালা নদীর দু-ধার—
তারি মাঝখানে কোথায় কে জানে
নৌকা চলেছে রাতে।
আকাশের তারা মিটি মিটি করে,
শিয়াল ডাকিছে প্রহরে প্রহরে,
তরীখানি বুঝি ঘর খুঁজি খুঁজি
তীরে তীরে ফিরে ভাসি।
ঘুম লয়ে সাথে চড়েছে তাহাতে
ঘুম-পাড়ানিয়া মাসি॥

সূর্য ও ফুল

অনুবাদ

পরিপূর্ণ মহিমার আগ্নেয় কুসুম
সূর্য ধায় লভিবারে বিশ্রামের ঘুম।
ভাঙা এক ভিত্তি-'পরে ফুল শুভ্রবাস,
চারি দিকে শুভ্র দল করিয়া বিকাশ
মাথা তুলে চেয়ে দেখে সুনীল বিমানে
অমর আলোকময় তপনের পানে।
ছোটো মাথা দুলাইয়া কহে ফুল গাছে,
'লাবণ্যকিরণছটা আমারো তো আছে।'

শীত

পাখি বলে, 'আমি চলিলাম।'
ফুল বলে, 'আমি ফুটিব না।'
মলয় কহিয়া গেল শুধু,
'বনে বনে আমি ছুটিব না।'
কিশলয় মাথাটি না তুলে
মরিয়া পড়িয়া গেল ঝরি,
সায়াহ্ন ধূমলঘন বাস
টানি দিল মুখের উপরি।
পাখি কেন গেল গো চলিয়া।
কেন ফুল কেন সে ফুটে না।
চপল মলয়-সমীরণ
বনে বনে কেন সে ছুটে না।
শীতের হৃদয় গেছে চলে,
অসাড় হয়েছে তার মন,
ত্রিবলিবলিত তার ভাল
কঠোর জ্ঞানের নিকেতন।
জ্যোৎস্নার যৌবন-ভরা রূপ,
ফুলের যৌবন পরিমল,
মলয়ের বাল্যখেলা যত,
পল্লবের বাল্যকোলাহল—
সকলি সে মনে করে পাপ,
মনে করে প্রকৃতির ভ্রম,
ছবির মতন বসে থাকা

সেই জানে জ্ঞানীর ধরম।
তাই পাখি বলে 'চলিলাম',
ফুল বলে 'আমি ফুটিব না',
মলয় কহিয়া গেল শুধু
'বনে বনে আমি ছুটিব না'।
আশা বলে 'বসন্ত আসিবে'—
ফুল বলে 'আমিও আসিব',
পাখি বলে 'আমিও গাহিব',
চাঁদ বলে 'আমিও হাসিব'।

বসন্তের নবীন হৃদয়
নূতন উঠেছে আঁখি মেলে—
যাহা দেখে তাই দেখে হাসে,
যাহা পায় তাই নিয়ে খেলে।
মনে তার শত আশা জাগে,
কী যে চায় আপনি না বুঝে—
প্রাণ তার দশ দিকে ধায়
প্রাণের মানুষ খুঁজে খুঁজে।
ফুল ফুটে, তারো মুখ ফুটে—
পাখি গায়, সেও গান গায়;
বাতাস বুকের কাছে এলে
গলা ধ'রে দুজনে খেলায়।
তাই শুনি 'বসন্ত আসিবে'
ফুল বলে 'আমিও আসিব',

পাখি বলে 'আমিও গাহিব',
চাঁদ বলে 'আমিও হাসিব'।

শীত, তুমি হেথা কেন এলে,
উত্তরে তোমার দেশ আছে—
পাখি সেথা নাহি গাহে গান,
ফুল সেথা নাহি ফুটে গাছে।
সকলি তুষারমরুময়,
সকলি আঁধার জনহীন—
সেথায় একেলা বসি বসি
জ্ঞানী গো, কাটায়ো তব দিন ॥

শীতের বিদায়

বসন্ত বালক মুখভরা হাসিটি,
বাতাস ব'য়ে ওড়ে চুল।
শীত চলে যায়, মারে তার গায়
মোটা মোটা গোটা ফুল।
আঁচল ভ'রে গেছে শত ফুলের মেলা,
গোলাপ ছুঁড়ে মারে টগর চাঁপা বেলা,
শীত বলে, 'ভাই, এ কেমন খেলা,
যাবার বেলা হল, আসি।'
বসন্ত হাসিয়ে বসন ধ'রে টানে,
পাগল করে দেয় কুহু কুহু গানে,
ফুলের গন্ধ নিয়ে প্রাণের 'পরে হানে,
হাসির 'পরে হানে হাসি।
ওড়ে ফুলের রেণু, ফুলের পরিমল,
ফুলের পাপড়ি উড়ে করে যে বিকল;
কুসুমিত শাখা, বনপথ ঢাকা,
ফুলের 'পরে পড়ে ফুল।
দক্ষিণে বাতাসে ওড়ে শীতের বেশ,
উড়ে উড়ে পড়ে শীতের শুভ্র কেশ;
কোন্ পথে যাবে না পায় উদ্দেশ,
হয়ে যায় দিক ভুল॥

বসন্ত বালক হেসেই কুটিকুটি,
টলমল করে রাঙা চরণ দুটি,

গান গেয়ে পিছে ধায় ছুটি ছুটি,
বনে লুটোপুটি যায়।
নদী তালি দেয় শত হাত তুলি,
বলাবলি করে ডালপালাগুলি,
লতায় লতায় হেসে কোলাকুলি—
অঙ্গুলি তুলি চায়।
রঙ্গ দেখে হাসে মল্লিকা মালতী,
আশেপাশে হাসে কতই জাতী যূথী,
মুখে বসন দিয়ে হাসে লজ্জাবতী
বনফুল-বধূগুলি।
কত পাখি ডাকে, কত পাখি গায়,
কিচিমিচিকিচি কত উড়ে যায়,
এ পাশে ও পাশে মাথাটি হেলায়,
নাচে পুচ্ছখানি তুলি।
শীত চলে যায়, ফিরে ফিরে চায়;
মনে মনে ভাবে এ কেমন বিদায়—
হাসির জ্বালায় কাঁদিয়ে পালায়,
ফুলঘায় হার মানে।
শুক্‌নো পাতা তার সঙ্গে উড়ে যায়,
উত্তরে বাতাস করে হায় হায়;
আপাদমস্তক ঢেকে কুয়াশায়
শীত গেল কোন্‌খানে॥

ফুলের ইতিহাস

বসন্তপ্রভাতে এক মালতীর ফুল
প্রথম মেলিল আঁখি তার,
প্রথম হেরিল চারি ধার॥

মধুকর গান গেয়ে বলে, 'মধু কই, মধু দাও দাও।'
হরষে হৃদয় ফেটে গিয়ে ফুল বলে, 'এই লও লও।'
বায়ু আসি কহে কানে কানে, 'ফুলবালা, পরিমল দাও।'
আনন্দে কাঁদিয়া কহে ফুল, 'যাহা আছে সব লয়ে যাও।'

তরুতলে চ্যুতবৃন্ত মালতীর ফুল
মুদিয়া আসিছে আঁখি তার,
চাহিয়া দেখিল চারি ধার॥

মধুকর কাছে এসে বলে, 'মধু কই, মধু চাই চাই।'
ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিয়া ফুল বলে 'কিছু নাই নাই।'
'ফুলবালা, পরিমল দাও' বায়ু আসি কহিতেছে কাছে।
মলিন বদন ফিরাইয়া ফুল বলে, 'আর কী বা আছে।'

শিশুর মৃত্যু

অনুবাদ

বেঁচে ছিল, হেসে হেসে
খেলা করে বেড়াত সে—
হে প্রকৃতি, তারে নিয়ে কী হল তোমার।
শত রঙ-করা পাখি
তোর কাছে ছিল না কি—
কত তারা, বন, সিন্ধু, আকাশ অপার।
জননীর কোল হতে কেন তবে কেড়ে নিলি,
লুকায়ে ধরার কোলে ফুল দিয়ে ঢেকে দিলি।

শততারাপুষ্পময়ী
মহতী প্রকৃতি অয়ি,
নাহয় একটি শিশু নিলি চুরি ক'রে—
অসীম ঐশ্বর্য তব
তাহে কি বাড়িল নব!
নূতন আনন্দকণা মিলিল কি ওরে।
অথচ তোমারি মতো বিশাল মায়ের হিয়া
সব শূন্য হয়ে গেল একটি সে শিশু গিয়া॥

আকুল আহ্বান

সন্ধে হল, গৃহ অন্ধকার—
মা গো, হেথায় প্রদীপ জ্বলে না।
একে একে সবাই ঘরে এল,
আমায় যে মা, 'মা' কেউ বলে না।
সময় হল, বেঁধে দেব চুল,
পরিয়ে দেব রাঙা কাপড়খানি।
সাঁঝের তারা সাঁঝের গগনে—
কোথায় গেল রানী আমার রানী॥

রাত্রি হল, আঁধার করে আসে,
ঘরে ঘরে প্রদীপ নিবে যায়।
আমার ঘরে ঘুম নেইকো শুধু—
শূন্য শেজ শূন্য-পানে চায়।
কোথায় দুটি নয়ন ঘুমে-ভরা,
নেতিয়ে-পড়া ঘুমিয়ে-পড়া মেয়ে—
শ্রান্ত দেহ ঢুলে পড়ে, তবু
মায়ের তরে আছে বুঝি চেয়ে
আঁধার রাতে চলে গেলি তুই,
আঁধার রাতে চুপিচুপি আয়।
কেউ তো তোরে দেখতে পাবে না,
তারা শুধু তারার পানে চায়।
এ জগৎ কঠিন— কঠিন—
কঠিন, শুধু মায়ের প্রাণ ছাড়া—

সেইখানে তুই আয় মা ফিরে আয়—
এত ডাকি, দিবি নে কি সাড়া॥

ফুলের দিনে সে যে চলে গেল,
ফুল-ফোটা সে দেখে গেল না।
ফুলে ফুলে ভরে গেল বন,
একটি সে তো পরতে পেল না।
ফুল যে ফোটে, ফুল যে ঝরে যায়—
ফুল নিয়ে যে আর-সকলে পরে,
ফিরে এসে সে যদি দাঁড়ায়
একটিও যে রইবে না তার তরে॥

খেলত যারা তারা খেলতে গেছে,
হাসত যারা তারা আজও হাসে।
তার তরে তো কেহই বসে নেই,
মা যে কেবল রয়েছে তার আশে।
হায় রে বিধি, সব কি ব্যর্থ হবে—
ব্যর্থ হবে মায়ের ভালোবাসা?
কত জনের কত আশা পূরে,
ব্যর্থ হবে মার প্রাণেরই আশা?

বিসর্জন

অনুবাদ

যে তোরে বাসে রে ভালো তারে ভালোবেসে বাছা,
চিরকাল সুখে তুই রোস।
বিদায়! মোদের ঘরে রতন আছিলি তুই,
এখন তাহারি তুই হোস।
আমাদের আশীর্বাদ নিয়ে তুই যা রে
এক পরিবার হতে অন্য পরিবারে।
সুখশান্তি নিয়ে যাস তোর পাছে পাছে,
দুঃখজ্বালা রেখে যাস আমাদের কাছে॥

হেথা রাখিতেছি ধরে, সেথা চাহিতেছে তোরে—
দেরি হল, যা তাদের কাছে।
প্রাণের বাছাটি মোর, লক্ষ্মীর প্রতিমা তুই,
দুইটি কর্তব্য তোর আছে—
একটু বিলাপ যাস আমাদের দিয়ে,
তাহাদের তরে আশা যাস সাথে নিয়ে;
এক বিন্দু অশ্রু দিস আমাদের তরে,
হাসিটি লইয়া যাস তাহাদের ঘরে॥

পুরোনো বট

লুটিয়ে পড়ে জটিল জটা,
ঘন পাতার গহন ঘটা,
হেথা-হোথায় রবির ছটা—
পুকুর-ধারে বট।
দশ দিকেতে ছড়িয়ে শাখা
কঠিন বাহু আঁকাবাঁকা
স্তব্ধ যেন আছে আঁকা,
শিরে আকাশ-পট।
নেবে নেবে গেছে জলে
শিকড়গুলো দলে দলে,
সাপের মতো রসাতলে
আলয় খুঁজে মরে।
শতেক শাখা-বাহু তুলি
বায়ুর সাথে কোলাকুলি,
আনন্দেতে দোলাদুলি
গভীর প্রেমভরে।
ঝড়ের তালে নড়ে মাথা
কাঁপে লক্ষকোটি পাতা,
আপন-মনে গায় সে গাথা,
দুলায় মহাকায়া।
তড়িৎ পাশে উঠে হেসে,
ঝড়ের মেঘ ঝটিৎ এসে
দাঁড়িয়ে থাকে এলোকেশে,
তলে গভীর ছায়া॥

নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছ
মাথায় লয়ে জট,
ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে
ওগো প্রাচীন বট।
কতই পাখি তোমার শাখে
বসে যে চলে গেছে,
ছোটো ছেলেরে তাদেরি মতো
ভুলে কি যেতে আছে।
তোমার মাঝে হৃদয় তারি
বেঁধেছিল যে নীড়।
ডালে-পালায় সাধগুলি তার
কত করেছে ভিড়।
মনে কি নেই সারাটা দিন
বসিয়ে বাতায়নে
তোমার পানে রইত চেয়ে
অবাক দুনয়নে।
তোমার তলে মধুর ছায়া,
তোমার তলে ছুটি,
তোমার তলে নাচত বসে
শালিখ পাখি দুটি।
ভাঙা ঘাটে নাইত কারা,
তুলত কারা জল,
পুকুরেতে ছায়া তোমার
করত টলমল।
জলের উপর রোদ পড়েছে

সোনামাখা মায়া,
ভেসে বেড়ায় দুটি হাঁস
দুটি হাঁসের ছায়া।
ছোটো ছেলে রইত চেয়ে,
বাসনা অগাধ—
মনের মধ্যে খেলাত তার
কত খেলার সাধ।
বায়ুর মতো খেলত যদি
তোমার চারি ভিতে,
ছায়ার মতো শুত যদি
তোমার ছায়াটিতে,
পাখির মতো উড়ে যেত,
উড়ে আসত ফিরে—
হাঁসের মতো ভেসে যেত
তোমার তীরে তীরে॥

মনে হ'ত তোমার ছায়ে
কতই কী যে আছে,
কাদের যেন ঘুম পাড়াতে
ঘুঘু ডাকত গাছে।
মনে হ'ত তোমার মাঝে
কাদের যেন ঘর—
আমি যদি তাদের হতেম!
কেন হলেম পর।

ছায়ার মতো ছায়ায় তারা
থাকে পাতার 'পরে,
গুন্‌গুনিয়ে সবাই মিলে
কতই যে গান করে।
দূরে লাগে মূলতানে তান,
প'ড়ে আসে বেলা,
ঘাটে বসে দেখে জলে
আলোছায়ার খেলা।
সন্ধে হলে খোঁপা বাঁধে
তাদের মেয়েগুলি,
ছেলেরা সব দোলায় বসে
খেলায় দুলি দুলি।
গহিন রাতে দখিন বাতে
নিঝুম চারি ভিত—
চাঁদের আলোয় শুভ্র তনু,
ঝিমি ঝিমি গীত।
ওখানেতে পাঠশালা নেই,
পণ্ডিতমশাই—
বেত হাতে নাইকো বসে
মাধব গোঁসাই।
সারাটা দিন ছুটি কেবল,
সারাটা দিন খেলা—
পুকুর-ধারে আঁধার-করা
বট গাছের তলা॥

আজকে কেন নাইকো তারা
আছে আর-সকলে।
তারা তাদের বাসা ভেঙে
কোথায় গেছে চলে!
ছায়ার মধ্যে মায়া ছিল,
ভেঙে দিল কে।
ছায়া কেবল রইল পড়ে,
কোথায় গেল সে।
ডালে বসে পাখিরা আজ
কোন্ প্রাণেতে ডাকে।
রবির আলো কাদের খোঁজে
পাতার ফাঁকে ফাঁকে।
গল্প কত ছিল যেন
তোমার খোপে-খাপে,
পাখির সঙ্গে মিলে-মিশে
ছিল চুপে-চাপে।
দুপুরবেলা নূপুর তাদের
বাজত অনুক্ষণ,
ছোটো দুটি ভাই-ভগিনীর
আকুল হত মন।
ছেলেবেলায় ছিল তারা,
কোথায় গেল শেষে।
গেছে বুঝি ঘুম-পাড়ানি
মাসি-পিসির দেশে॥

স্নেহস্মৃতি

সেই চাঁপা, সেই বেলফুল—
কে তোরা আজি এ প্রাতে এনে দিলি মোর হাতে,
জল আসে আঁখিপাতে, হৃদয় আকুল।
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল॥

কত দিন, কত সুখ, কত হাসি, স্নেহমুখ,
কত কী পড়িল মনে প্রভাতবাতাসে—
স্নিগ্ধ প্রাণ সুধাভরা, শ্যামল সুন্দর ধরা,
তরুণ অরুণরেখা নির্মল আকাশে;
সকলি জড়িত হয়ে অন্তরে যেতেছে বয়ে,
ডুবে যায় অশ্রুজলে হৃদয়ের কূল;
মনে পড়ে তারি সাথে জীবনের কত প্রাতে
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল॥

বড়ো বেসেছিনু ভালো এই শোভা, এই আলো,
এ আকাশ, এ বাতাস, এই ধরাতল;
কত দিন বসি তীরে শুনেছি নদীর নীরে
নিশীথের সমীরণে সংগীত তরল।
কত দিন পরিয়াছি সন্ধ্যাবেলা মালাগাছি
স্নেহের হস্তের গাঁথা বকুলমুকুল;
বড়ো ভালো লেগেছিল যেদিন এ হাতে দিল
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল॥

কত শুনিয়াছি বাঁশি, কত দেখিয়াছি হাসি,
কত উৎসবের দিনে কত যে কৌতুক;
কত বরযার বেলা সঘন আনন্দমেলা,
কত গানে জাগিয়াছে সুনিবিড় সুখ।
এ প্রাণ বীণার মতো ঝংকারি উঠেছে কত,
আসিয়াছে শুভক্ষণ কত অনুকূল—
মনে পড়ে তারি সাথে কত দিন কত প্রাতে
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল॥

মঙ্গলগীত

এত বড়ো এ ধরণী মহাসিন্ধু-ঘেরা
দুলিতেছে আকাশসাগরে—
দিন দুই হেথা রহি মোরা মানবেরা
শুধু কি মা, যাব খেলা করে।
তাই কি ধাইছে গঙ্গা ছাড়ি হিমগিরি,
অরণ্য বহিছে ফুল ফল,
শতকোটি রবি তারা আমাদের ঘিরি
গনিতেছে প্রতি দণ্ড পল॥

নাই কি মা, মানবের গভীর ভাবনা,
হৃদয়ের সীমাহীন আশা।
জেগে নাই অন্তরেতে অনন্ত চেতনা,
জীবনের অনন্ত পিপাসা!
হৃদয়েতে শুষ্ক কি মা, উৎস করুণার,
শুনি না কি দুখীর ক্রন্দন।
জগৎ শুধু কি মা গো, তোমার আমার
ঘুমাবার কুসুম-আসন॥

শুনো না কাহারা ওই করে কানাকানি
অতি তুচ্ছ ছোটো ছোটো কথা—
পরের হৃদয় লয়ে করে টানাটানি
শকুনির মতো নির্মমতা।
শুনো না করিছে কারা কথা-কাটাকাটি

মাতিয়া জ্ঞানের অভিমানে—
রসনায় রসনায় ঘোর লাঠালাঠি,
আপনার বুদ্ধিরে বাখানে॥

আছে মা, তোমার মুখে স্বর্গের কিরণ,
হৃদয়েতে উষার আভাস,
খুঁজিছে সরল পথ ব্যাকুল, নয়ন,
চারি দিকে মর্তের প্রবাস।
আপনার ছায়া ফেলি আমরা সকলে
পথ তোর অন্ধকারে ঢাকি—
ক্ষুদ্র কথা, ক্ষুদ্র কাজ, ক্ষুদ্র শত ছলে
কেন তোরে ভুলাইয়া রাখি॥

তুমি এসো দূরে এসো পবিত্র নিভৃতে,
ক্ষুদ্র অভিমান যাও ভুলি।
সযতনে ঝেড়ে ফেলো বসন হইতে
প্রতি নিমেষের যত ধূলি।
নিমেষের ক্ষুদ্র কথা ক্ষুদ্র রেণুজাল
আচ্ছন্ন করিছে মানবেরে—
উদার অনন্ত তাই হতেছে আড়াল
তিল তিল ক্ষুদ্রতার ঘেরে॥

অনন্তের মাঝখানে দাঁড়াও মা আসি,
চেয়ে দেখো আকাশের পানে;
পড়ুক বিমল বিভা পূর্ণরূপরাশি

স্বর্গমুখী কমলনয়ানে।
আনন্দে ফুটিয়া ওঠো শুভ্র সূর্যোদয়ে
প্রভাতের কুসুমের মতো;
দাঁড়াও সায়াহ্ন-মাঝে পবিত্রহৃদয়ে
মাথাখানি করিয়া আনত॥

শোনো শোনো উঠিতেছে সুগম্ভীর বাণী,
ধ্বনিতেছে আকাশ পাতাল—
বিশ্বচরাচর গাহে কাহারে বাখানি
আদিহীন অন্তহীন কাল।
যাত্রী সবে ছুটিয়াছে শূন্যপথ দিয়া,
উঠেছে সংগীত-কোলাহল—
ওই নিখিলের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া
মা, আমরা যাত্রা করি চল্॥
যাত্রা করি বৃথা যত অহংকার হতে,
যাত্রা করি ছাড়ি হিংসাদ্বেষ;
যাত্রা করি স্বর্গময়ী করুণার পথে
শিরে ধরি সত্যের আদেশ।
যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে
প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক;
আয় মা গো, যাত্রা করি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি নিজ দুঃখশোক॥

জেনো মা, এ সুখে-দুঃখে-আকুল সংসারে
মেটে না সকল তুচ্ছ আশ;

তা বলিয়া অভিমানে অনন্ত তাঁহারে
কোরো না কোরো না অবিশ্বাস।
সুখ ব'লে যাহা চাই সুখ তাহা নয়,
কী যে চাই জানি না আপনি;
আঁধারে জ্বলিছে ওই, ওরে কোরো ভয়—
ভুজঙ্গের মাথার ও মণি॥

কিছুই চাব না, মা গো, আপনার তরে—
পেয়েছি যা শুধিব সে ঋণ;
পেয়েছি যে প্রেমসুধা হৃদয়-ভিতরে
ঢালিয়া তা দিব নিশিদিন।
সুখ শুধু পাওয়া যায় সুখ না চাহিলে,
প্রেম দিলে প্রেমে পূরে প্রাণ,
নিশিদিশি আপনার ক্রন্দন গাহিলে
ক্রন্দনের নাহি অবসান॥

দাঁড়াও সে অন্তরের শান্তিনিকেতনে
চিরজ্যোতি চিরচ্ছায়াময়;
ঝড়হীন রৌদ্রহীন নিভৃত সদনে
জীবনের অনন্ত আলয়।
পুণ্য জ্যোতি মুখে লয়ে পুণ্য হাসিখানি
অন্নপূর্ণা জননী-সমান,
মহাসুখে সুখ দুঃখ কিছু নাহি মানি
করো সবে সুখশান্তি দান॥

মা আমার, এই জেনো হৃদয়ের সাধ—
তুমি হও লক্ষ্মীর প্রতিমা;
মানবেরে জ্যোতি দাও, করো আশীর্বাদ
অকলঙ্ক-মূর্তি মধুরিমা।
কাছে থেকে এত কথা বলা নাহি হয়,
হেসে খেলে দিন যায় কেটে;
দূরে ভয় হয় পাছে না পাই সময়,
বলিবার সাধ নাহি মেটে॥

কত কথা বলিবারে চাহি প্রাণপণে—
কিছুতে মা, বলিতে না পারি;
স্নেহমুখখানি তোর পড়ে মোর মনে,
নয়নে উথলে অশ্রুবারি।
সুন্দর মুখেতে তোর মগ্ন আছে ঘুমে
একখানি পবিত্র জীবন;
ফলুক সুন্দর ফল সুন্দর কুসুমে
আশীর্বাদ করো মা, গ্রহণ॥

২

চারি দিকে তর্ক উঠে সাঙ্গ নাহি হয়,
কথায় কথায় বাড়ে কথা।
সংশয়ের উপরেতে চাপিছে সংশয়,
কেবলি বাড়িছে ব্যাকুলতা।
ফেনার উপরে ফেনা, ঢেউ-'পরে ঢেউ

গরজনে বধির শ্রবণ—
তার কোন্ দিকে আছে নাহি জানে কেউ,
হা হা করে আকুল পবন॥
এই কল্লোলের মাঝে নিয়ে এসো কেহ
পরিপূর্ণ একটি জীবন—
নীরবে মিটিয়া যাবে সকল সন্দেহ,
থেমে যাবে সহস্র বচন।
তোমার চরণে আসি মাগিবে মরণ
লক্ষ্যহারা শত শত মত,
যে দিকে ফিরাবে তুমি দুখানি নয়ন
সে দিকে হেরিবে সবে পথ॥

অন্ধকার নাহি যায় বিবাদ করিলে,
মানে না বাহুর আক্রমণ;
একটি আলোকশিখা সমুখে ধরিলে
নীরবে করে সে পলায়ন।
এসো মা, উষার আলো, অকলঙ্কপ্রাণ—
দাঁড়াও এ সংসার-আঁধারে;
জাগাও জাগ্রত হৃদে আনন্দের গান,
কূল দাও নিদ্রার পাথারে॥

চারি দিকে নৃশংসতা করে হানাহানি,
মানবের পাষাণপরান;
শানিত ছুরির মতো বিঁধাইয়া বাণী
হৃদয়ের রক্ত করে পান।

তৃষিত কাতর প্রাণী মাগিতেছে জল,
উল্কাধারা করিছে বর্ষণ,
শ্যামল আশার ক্ষেত্র করিয়া নিষ্ফল
স্বার্থ দিয়ে করিছে কর্ষণ ॥

শুধু এসে একবার দাঁড়াও কাতরে
মেলি দুটি সকরুণ চোখ;
পড়ুক দু ফোঁটা অশ্রু জগতের 'পরে
যেন দুটি বাল্মীকির শ্লোক।
ব্যথিত করুক স্নান তোমার নয়নে
করুণার অমৃতনির্ঝরে;
তোমারে কাতর হেরি মানবের মনে
দয়া হবে মানবের 'পরে ॥

সমুদয় মানবের সৌন্দর্যে ডুবিয়া
হও তুমি অক্ষয় সুন্দর—
ক্ষুদ্র রূপ কোথা যায় বাতাসে উবিয়া
দুই চারি পলকের পর।
তোমার সৌন্দর্যে হোক মানব সুন্দর,
প্রেমে তব বিশ্ব হোক আলো।
তোমারে হেরিয়া যেন মুগুধ-অন্তর
মানুষে মানুষ বাসে ভালো ॥

৩

আমার এ গান, মা গো, শুধু কি নিমেষে
মিলাইবে হৃদয়ের কাছাকাছি এসে।
আমার প্রাণের কথা নিদ্রাহীন আকুলতা
শুধু নিশ্বাসের মতো যাবে কি মা, ভেসে॥

এ গান তোমারে সদা ঘিরে যেন রাখে,
সত্যের পথের 'পরে নাম ধ'রে ডাকে।
সংসারের সুখে দুখে চেয়ে থাকে তোর মুখে,
চির-আশীর্বাদ-সম কাছে কাছে থাকে॥

বিজনে সঙ্গীর মতো করে যেন বাস,
অনুক্ষণ শোনে তোর হৃদয়ের আশ;
পড়িয়া সংসারঘোরে কাঁদিতে হেরিলে তোরে
ভাগ ক'রে নেয় যেন দুখের নিশ্বাস॥

সংসারের প্রলোভন যবে আসি হানে
মধুমাখা বিষবাণী দুর্বল পরানে,
এ গান আপন সুরে মন তোর রাখে পুরে—
ইষ্টমন্ত্রসম সদা বাজে তোর কানে॥

আমার এ গান যেন সুদীর্ঘ জীবন
তোমার বসন হয়, তোমার ভূষণ—
পৃথিবীর ধূলিজাল ক'রে দেয় অন্তরাল,
তোমারে করিয়া রাখে সুন্দর শোভন॥

আমার এ গান যেন নাহি মানে মানা—
উদার বাতাস হয়ে এলাইয়া ডানা
সৌরভের মতো তোরে নিয়ে যায় চুরি ক'রে,
খুঁজিয়া দেখাতে যায় স্বর্গের সীমানা॥

এ গান যেন রে হয় তোর ধ্রুবতারা,
অন্ধকারে অনিমেষে নিশি করে সারা;
তোমার মুখের 'পরে জেগে থাকে স্নেহভরে,
অকূলে নয়ন মেলি দেখায় কিনারা॥

আমার এ গান যেন পশি তোর কানে
মিলায়ে মিশায়ে যায় সমস্ত পরানে—
তপ্ত শোণিতের মতো বহে শিরে অবিরত,
আনন্দে নাচিয়া উঠে মহত্ত্বের গানে॥

এ গান বাঁচিয়া থাকে যেন তোর মাঝে,
আঁখিতারা হয়ে তোর আঁখিতে বিরাজে।
এ যেন রে করে দান সতত নূতন প্রাণ,
এ যেন জীবন পায় জীবনের কাজে॥

যদি যাই, মৃত্যু যদি নিয়ে যায় ডাকি,
এই গানে রেখে যাব মোর স্নেহ-আঁখি।
যবে হায় সব গান হয়ে যাবে অবসান
এ গানের মাঝে আমি যেন বেঁচে থাকি॥

আশীর্বাদ

ইহাদের করো আশীর্বাদ।
ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণগুলি,
নন্দনের এনেছে সম্বাদ—
ইহাদের করো আশীর্বাদ ॥

ছোটো ছোটো হাসিমুখ জানে না ধরার দুখ,
হেসে আসে তোমাদের দ্বারে।
নবীন নয়ন তুলি কৌতুকেতে দুলি দুলি
চেয়ে চেয়ে দেখে চারি ধারে।
সোনার রবির আলো কত তার লাগে ভালো,
ভালো লাগে মায়ের বদন।
হেথায় এসেছে ভুলি, ধূলিরে জানে না ধূলি,
সবই তার আপনার ধন।
কোলে তুলে লও এরে— এ যেন কেঁদে না ফেরে,
হরষেতে না ঘটে বিষাদ।
বুকের মাঝারে নিয়ে পরিপূর্ণ প্রাণ দিয়ে
ইহাদের করো আশীর্বাদ ॥

নূতন প্রবাসে এসে সহস্র পথের দেশে
নীরবে চাহিছে চারি ভিতে।
এত শত লোক আছে, এসেছে তোমারি কাছে
সংসারের পথ শুধাইতে।

যেথা তুমি লয়ে যাবে কথাটি না কয়ে যাবে,
সাথে যাবে ছায়ার মতন।
তাই বলি, দেখো দেখো, এ বিশ্বাস রেখো রেখো
পাথারে দিয়ো না বিসর্জন ॥

ক্ষুদ্র এ মাথার 'পর রাখো গো করুণ কর,
ইহারে কোরো না অবহেলা।
এ ঘোর সংসার-মাঝে এসেছে কঠিন কাজে,
আসে নি করিতে শুধু খেলা।
দেখে মুখশতদল চোখে মোর আসে জল,
মনে হয় বাঁচিবে না বুঝি—
পাছে সুকুমার প্রাণ ছিঁড়ে হয় খান্‌-খান্‌
জীবনের পারাবারে যুঝি ॥

এই হাসিমুখগুলি হাসি পাছে যায় ভুলি,
পাছে ঘেরে আঁধার প্রমাদ।
ইহাদের কাছে ডেকে বুকে রেখে, কোলে রেখে
তোমরা করো গো আশীর্বাদ।
বলো, 'সুখে যাও চ'লে ভবের তরঙ্গ দ'লে,
স্বর্গ হতে আসুক বাতাস।
সুখদুঃখ কোরো হেলা— সে কেবল ঢেউখেলা
নাচিবে তোদের চারি পাশ।'

—

গ্রন্থপরিচয়

শিশু ১৩১০ আশ্বিনে অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের সপ্তম ভাগ রূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ইহা নূতন ও পুরাতন রচনার সংকলন; তন্মধ্যে নূতন কবিতার সংখ্যা ৩২ ও তাহাদের সন্নিবেশ গ্রন্থের প্রথমেই। আরো চারিটি কবিতা (অন্তসখী/বিচ্ছেদ/উপহার/পরিচয়) পুরাতন কবিতার এমনই রূপান্তর যে তাহাদেরও নূতন বলা অসংগত হয় না। শেষোক্ত কবিতা-চতুষ্টয় এবং আরো ২৬টি পুরাতন কবিতা গ্রন্থের শেষাংশে স্থান লইয়াছে (নদী হইতে আশীর্বাদ অবধি)— এগুলির রচনা নানা সময়ে নানা উপলক্ষে; রবীন্দ্রনাথের পূর্বপ্রকাশিত কয়েকটি কাব্য হইতে, কয়েক ক্ষেত্রে সাময়িক পত্র হইতেই, শিশু কাব্যে ইহাদের সংকলন।

নূতন কবিতার সবগুলি (পূর্বোক্ত রূপান্তরিত কবিতা-চতুষ্টয়-সহ) ১৩১০ সনের ৫ শ্রাবণ হইতে ৬ ভাদ্রের মধ্যে আলমোড়ার শৈলাবাসে লিখিত। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ মধ্যমা কন্যা রেণুকার আরোগ্য-কামনায় তাঁহাকে লইয়া ঐ স্থলে বাস করেন।

নূতন ৩৬টি কবিতার 'খেলা' বাদ দিয়া আর সবই শান্তিনিকেতনস্থ রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহের ১১৫-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়। ১৩৭৭ শ্রাবণ-আশ্বিনের বিশ্বভারতী পত্রিকায় (পৃ ৭২-৯৫) ইহার বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনা প্রকাশিত। ঐ আলোচনার সূত্রে নূতন রচনার পারম্পর্য, অনেক ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অথবা অনুমিত তারিখও জানা যায়— সেই-সব তারিখ শিশুর ১৩৭৯ সংস্করণে যথাস্থানে বন্ধনী-মধ্যে সংকলন করা হইয়াছে।

নূতন কবিতার একটি (খেলা/পাণ্ডুলিপি হইতে যাহা খোওয়া গিয়াছে) ও পুরাতন কবিতার অনেকগুলি সাময়িক পত্রে মুদ্রিত। কয়েক ক্ষেত্রে নামান্তর এবং বহু ক্ষেত্রে বহু পাঠবৈচিত্র্য থাকিলেও সাময়িক পত্রে প্রকাশের এক তালিকা এ স্থলে সংকলন করা হইল—

		পৃষ্ঠাঙ্ক
অন্তসখী[1]	...	
আকুল আহ্বান	বালক[2]	আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২।৩২৭
আশীর্বাদ	ভারতী ও বালক	বৈশাখ ১২৯৩।৬০
উপহার[3]	...	
কাগজের নৌকা	মুকুল	আশ্বিন ১৩০২।৫৮
খেলা	বঙ্গদর্শন	ভাদ্র ১৩১০।২৪৬
পরিচয়[4]	...	
পাখির পালক	ভারতী ও বালক	শ্রাবণ ১২৯৩।২৩৪
পুরোনো বট	বালক	ভাদ্র ১২৯২।২২৬
পূজার সাজ	মুকুল	চৈত্র ১৩০৬।১৭৫
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর	বালক	বৈশাখ ১২৯২।১
বিম্ববতী	সাধনা	বৈশাখ ১২৯৯।৫৩৫
বিসর্জন	ভারতী	আষাঢ় ১২৮৮।১৪৬
মালক্ষ্মী	বালক	জ্যৈষ্ঠ ১২৯২।৫৯
শিশুর মৃত্যু	ভারতী	শ্রাবণ ১২৯১।১৬৯
শীত	ভারতী	মাঘ ১২৮৭।৪৫৫

১ পুরাতনের আধারে নূতন রচনা আলমোড়ায়, সম্ভবতঃ ১ ভাদ্র ১৩১০ তারিখে। মূল কবিতা : শরতের শুকতারা : ভারতী। অগ্রহায়ণ ১২৯১। পৃ ৩৫৪

২ বালক-ধৃত পাঠ এ স্থলে, তৎপূর্বে ভিন্নভাবে কড়ি ও কোমল কাব্যে, বহুশঃ পরিবর্তিত। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-বিবরণ (পুষ্পাঞ্জলি) : বিশ্বভারতী পত্রিকা। শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫। পৃ ৮১-৮৩

৩ পুরাতনের আধারে নূতন রচনা আলমোড়ায়, ১৩১০ ভাদ্রে ৬ তারিখের পূর্বে। পূর্বরূপ : জন্মতিথির উপহার : বালক। চৈত্র ১২৯২। পৃ ৫৬০

৪ পূর্ববৎ সম্ভবতঃ ৬ ভাদ্রে বা ২।১ দিন পূর্বে রচিত। পূর্বরূপ : চিঠি : বালক। ফাল্গুন ১২৯২। পৃ ৫০৮

		পৃষ্ঠাঙ্ক
শীতের বিদায় [ফুলের ঘা]	বালক	বৈশাখ ১২৯২।৫৬
সাত ভাই চম্পা	বালক	আষাঢ় ১২৯২।১০৭
সাধ	ভারতী	বৈশাখ ১২৯০।৭
সুখদুঃখ[৫]	মুকুল	শ্রাবণ ১৩০৭।৬৩
সূর্য ও ফুল	ভারতী	আষাঢ় ১২৮৮।১৪৭
স্নেহস্মৃতি	ভারতী ও বালক	কার্তিক ১৩০২।৩৬১
হাসিরাশি	বালক	শ্রাবণ ১২৯২।১৭৯

ফুলের ইতিহাস কবিতার ২ অংশ— বসন্তপ্রভাতে এক ইত্যাদি/তরুতলে চ্যুতবৃন্ত [ছিন্নবৃন্ত] ইত্যাদি— মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের রুদ্রচণ্ড (১২৮৮) নাটকে দুইটি গান-রূপে প্রচারিত, পরে রবিচ্ছায়ায় (১২৯২) ও বর্তমানে তৃতীয়খণ্ড গীতবিতানে সংকলিত। বিভিন্ন গ্রন্থে, বিশেষতঃ শিশু কাব্যে, সংস্কার ও সংক্ষেপণের অনুরোধে কিরূপ পরিবর্তন করা হইয়াছে তুলনায় আলোচনার যোগ্য। আকুল আহ্বান ও মঙ্গলগীত কবিতা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানিতে হইলে ১৩৭৬ বৈশাখ হইতে প্রচলিত কড়ি ও কোমল কাব্যের গ্রন্থপরিচয়ে উত্তরটীকা বা মন্তব্য ৯ ও ১০ দ্রষ্টব্য। শেষোক্ত টীকায় ইহাও বলা হইয়াছে যে, মঙ্গলগীত কবিতা-ত্রয়ীর রচনা বন্দোরায় ১৮৬৬ খৃস্টাব্দের মে-জুনে (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১২৯৩)।

শিশু কাব্যের যে কবিতাগুলির কবি-কৃত ইংরেজি ভাষান্তর বা রূপান্তর দেখা যায় *The Crescent Moon* (1913) কাব্যে তাহারও এক তালিকা দেওয়া গেল—

অপযশ	পুরোনো বট (অংশ)
আকুল আহ্বান (অংশ)	প্রশ্ন
আশীর্বাদ	বিচার
উপহার	বিচিত্র সাধ

৫ ক্ষণিকা কাব্যে ও মুকুল পত্রে প্রায় একই কালে প্রকাশিত।

কাগজের নৌকা
কেন মধুর
খেলা
খোকা
খোকার রাজ্য
ঘুম-চোরা
চাতুরী
ছুটির দিনে
ছোটো বড়ো
জগৎ-পারাবারের তীরে ইত্যাদি
জন্মকথা
জ্যোতিষশাস্ত্র
দুঃখহারী
নির্লিপ্ত
নৌকাযাত্রা
বিজ্ঞ
বিদায়
বীরপুরুষ
বৈজ্ঞানিক
ব্যাকুল
মঙ্গলগীত
[দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ; ইংরেজিতে দুইটি কবিতা]
মাঝি
মাতৃবৎসল
রাজার বাড়ি
লুকোচুরি
সমব্যথী
সমালোচক
স্নেহস্মৃতি

ভিতরে ও বাহিরে কবিতার সংক্ষিপ্ত মর্মানুবাদ দুইটি বাক্যে তথা অনুচ্ছেদে সংহৃত ও *The Fugitive* (1921) গ্রন্থে সংকলিত : *In Baby's world, the trees* etc.

ভাষান্তর উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক আপন কবিতার রূপান্তর নানা দিক দিয়া কত বিচিত্র ও চমৎকারজনক হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত দিতে হইলে পূর্বোক্ত কবিতাটি ও *The Crescent Moon* -ধৃত *The Rainy Day* (আষাঢ়/ক্ষণিকা) উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে (১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ তারিখে) গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্য ক্ষুদ্র দুইটি ভূমিকা -সহ আবৃত্তি করেন শিশু কাব্যের লুকোচুরি ও বীরপুরুষ কবিতা।

বিশ্বভারতী-কর্তৃক বীরপুরুষ কবিতার স্বতন্ত্র সচিত্র প্রকাশ ১৩৬৯ বৈশাখে (১৯৬২)। ইহার পূর্বে (১৯৬১) রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে স্বল্প

সংখ্যায় শিশু কাব্যেরও এক সচিত্র সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

শিশুর অন্তর্গত নদী কবিতার একটি 'বিজ্ঞাপন' বা ভূমিকা -সহ গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ '২২শে মাঘ ১৩০২' তারিখে। উহার উৎসর্গপত্রে দেখা যায়; 'পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তে তাঁহার শুভ পরিণয় দিনে এই গ্রন্থখানি উপহৃত হইল। ২২শে মাঘ, ১৩০২।' ১৩৭১ বৈশাখে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী-অঙ্কিত চিত্রসহ নদীর একটি স্বতন্ত্র সংস্করণ পুনঃপ্রকাশিত হয়।

১৩৮৯ মুদ্রণে পাণ্ডুলিপি ও প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ অনুসারে "পরিচয়" কবিতার পৃ ১১৮, ছত্র ৭-এর সংশোধিত পাঠ : 'তাহার' স্থলে 'তাঁহার'।

"অভিমানিনী"। পৃ ১২৬, ছত্র ১৬। 'এসে' স্থলে শুদ্ধপাঠ 'হেসে'।

গ্রন্থপরিচয়-সংকলন : কানাই সামন্ত

প্রথম ছত্রের সূচী

অমন করে আছিস কেন মা গো	৪৫
অরুণময়ী তরুণী উষা	১৩৭
আমার এ গান, মা গো	১৬৬
আমার খোকা করে গো যদি মনে	২৫
আমার খোকার কত যে দোষ	২৩
আমার যেতে ইচ্ছে করে	৫৭
আমার রাজার বাড়ি কোথায়	৫৫
আমি আজ কানাই মাস্টার	৪১
আমি যখন পাঠশালাতে যাই	৩৯
আমি যদি দুষ্টুমি করে	৭৭
আমি শুধু বলেছিলেম	৭০
আশ্বিনের মাঝামাঝি	১২৭
ইহাদের করো আশীর্বাদ	১৬৯
একটি মেয়ে আছে জানি	১১৫
এখনো তো বড়ো হই নি আমি	৪৭
এত বড়ো এ ধরণী মহাসিন্ধু-ঘেরা	১৬০
এলোথেলো চুলগুলি ছড়িয়ে	১২৬
ওই দেখো মা, আকাশ ছেয়ে	৬২
ওরে তোরা কি জানিস কেউ	৮৩
ওহে নবীন অতিথি	১০৯
কার পানে মা, চেয়ে আছ	১৩১
কে নিল খোকার ঘুম হরিয়া	১৯

প্রথম ছত্রের সূচী

খুকি তোমার কিচ্ছু বোঝে না মা	৪৩
খেলাধুলো সব রহিল পড়িয়া	১২৪
খোকা থাকে জগৎ-মায়ের অন্তঃপুরে	৩৩
খোকা মাকে শুধায় ডেকে	১১
খোকার চোখে যে ঘুম আসে	১৬
খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে	৩০
ঘুমিয়ে পড়েছে শিশুগুলি	১৩৫
চারি দিকে তর্ক উঠে সাঙ্গ নাহি হয়	১৬৪
ছুটি হলে রোজ ভাসাই জলে	১৩৯
জগৎ-পারাবারের তীরে	৯
তবে আমি যাই গো তবে যাই	৮১
তোমার কটি-তটের ধটি	১৩
দিনের আলো নিবে এল	৯৬
নাম রেখেছি বাব্‌লারানী	১১২
পরিপূর্ণ মহিমার আগ্নেয় কুসুম	১৪২
পাখি বলে, আমি চলিলাম	১৪৩
বসেছে আজ রথের তলায়	১৩০
বসন্তপ্রভাতে এক মালতীর ফুল	১৪৮
বসন্ত বালক মুখভরা হাসিটি	১৪৬
বাগানে ওই দুটো গাছে	১১৯
বাছা রে, তোর চক্ষে কেন জল	২১
বাছা রে মোর বাছা	২৭

প্রথম ছত্রের সূচী

বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে	৫০
বাবা যদি রামের মতো	৬৬
বেঁচে ছিল, হেসে হেসে খেলা করে বেড়াত সে	১৪৯
মধু মাঝির ওই যে নৌকোখানা	৬০
মনে করো তুমি থাকবে ঘরে	৭৯
মনে করো, যেন বিদেশ ঘুরে	৫২
মা গো, আমায় ছুটি দিতে বল্‌	৩৭
মেঘের মধ্যে মা গো, যারা থাকে	৭৫
যদি খোকা না হয়ে	৩৮
যে তোরে বাসে রে ভালো	১৫২
যেম্‌নি মা গো, গুরু গুরু	৭২
রঙিন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে	২৯
রজনী একাদশী	১১০
লুটিয়ে পড়ে জটিল জটা	১৫৩
সন্ধে হল, গৃহ অন্ধকার	১৫০
সযত্নে সাজিল রানী, বাঁধিল কবরী	১০৫
সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে	১০০
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল	১৫৮
স্নেহ-উপহার এনে দিতে চাই	১২১
হাসিতে ভরিয়ে গেছে হাসিমুখখানি	১৩৩

₹ 100

ISBN 978-81-7522-058-4